মার্কসবাদ

মানবেন্দ্রনাথ রায়

অনুবাদক ঃ সমরেন রায়

রেণাশাঁ পাবলিশার্স
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট ঃ কলিকাতা।

প্রথম মুদ্রন : অগ্রহায়ণ ১৩৫৩

দাম—দেড় টাকা।

প্রকাশক :

প্রবোধ ভট্টাচার্য্য, রেণাশাঁ পাবলিশার্স

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মার্কসবাদ

মানবেন্দ্রনাথ রায়

সূচীপত্র

১। মার্কসবাদ (১)..............................১

(What is Marxism)

২। মার্কসবাদ (২)..............................২২

(Marxism and Moral Philosophy)

৩। বিজ্ঞান, দর্শন ও রাজনীতি......................৩৩

(Science, Philosophy and Politics)

ভুমিকা।

আমাদের দেশে মার্কসবাদ সম্বন্ধে নানারকম ভ্রান্ত ধারনা প্রচলিত আছে। মার্কসবাদ কি? এ জানবার আগেই মার্কসীয় দর্শন ও রাজনীতির উপর কতকগুলি অহেতুক দোষারোপ করা হয়। সাধারণত মার্কসবাদ বলে আমাদের দেশে যা প্রচলিত আছে—তা' অত্যন্ত বিকৃত এবং অস্পষ্ট। এবং মার্কসবাদ প্রচারকদের মধ্যেও অনেকের এই বৈজ্ঞানিক দর্শন সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান ও ধারণা না থাকায়, ইহা আরও বিকৃত হয়েছে এবং সেকারণে ইহা সাধারণের কাছে ঘৃণ্য ও ত্যজ্য হয়ে রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ইতিহাস ও দর্শন পর্য্যালোচনা করে, মার্কস ইতিহাসের এক বিশেষ ব্যাখ্যা করেন; এবং ইতিহাস ও দর্শনকে চিরপরিবর্ত্তনশীল বিজ্ঞানের পর্য্যায়ভূক্ত করেন। যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মার্কস ইতিহাসের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিশ্লেষন করেন—সেই দৃষ্টিভঙ্গী হলো প্রধানত অর্থনৈতিক। এবং মার্কসীয় দর্শন ও রাজনীতির মূল ও প্রধান ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। ইতিহাসের এই অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি দেখান যে, মানব সমাজ পূর্ব্বে জমিদারী বা সামন্ত প্রথার নিয়মকানুন অনুযায়ী চলতো, ক্রমশঃ ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সাম্যবাদে পরিণত হবে। মোটামুটি এই হলো ইতিহাসের মার্কসীয় রূপ।

কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক কারণই ইতিহাসের প্রধান কারণ নয়—ইতিহাস গঠন এবং সংস্কারে মনের অংশ খুব বেশী। মানুষের

আচার ব্যবহার, তার সংস্কৃতি তার মন ও মত তার ব্যক্তিগত সত্ত্বা ও দৈনন্দিন জীবনের উপর নির্ভর করে। এবং এই মন ও ভাব আবার সমাজে প্রতিফলিত হয় এবং সমাজকে পুনর্গঠন করতে, সংস্কার করতে ব্যাপৃত হয়। তবে যদিও এই পরিবর্ত্তনে মানুষের মন এবং প্রতিভার প্রভাব ও গুরুত্ব খুবই বেশী তবুও অর্থনৈতিক সংস্কার ও পুনর্গঠনের দ্বারাই এক সমাজ ব্যবস্থা অন্য সমাজ ব্যবস্থার থেকে পৃথক। এবং সর্ব্বসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতিই হলো সভ্যতার আধার। মানুষের মননশীলতা, তার সভ্যতা, সংস্কৃতি সবই নির্ভর করে প্রধানত তার অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার উপর। কারণ সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রধান ভিত্তি অর্থাৎ অবসর ব্যক্তিগত অর্থ-নৈতিক স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপর নির্ভর করে। তাই যে মানুষ ও যে দেশ অর্থনৈতিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে, অনুন্নত, সেখানে সাম্য, স্বাধীনতা, সভ্যতা, সংস্কৃতির কথাই উঠতে পারেনা। অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থায় ব্যক্তিগত সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নতির নজির পাওয়া যায় কিন্তু সমষ্টিগত উন্নতির নজির পাওয়া যায়না ; তাই অর্থনৈতিক দিকটা ইতিহাস ও দর্শনের একটি বিশেষ এবং প্রধান ভিত্তি।

তা'ছাড়া মার্কসই যে, ইতিহাস, দর্শন ও রাজনীতির শেষ কথা বলে গেছেন তা' নয়। মার্কস ইতিহাসের এক বিশেষ রূপ দেখিয়ে গেছেন, সমাজ ও সভ্যতার এক বিশেষ দর্শন সৃষ্টি করে গেছেন। মার্কসবাদ কোন বিশেষ মত নয়, ইহা শুধু সমাজ ও জীবনের বৈজ্ঞানিক, যুক্তিপূর্ণ, পরিবর্ত্তন-শীল দৃষ্টিভঙ্গী, আজ যদি এর পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়, মার্কসের কতকগুলি বিচার বিশ্লেষনকে বাতিল করে তার পরিবর্ত্তে নূতন যুক্তির ও নূতন পথ অবলম্বনের প্রয়োজন হয়, তা'ও করতে হবে এবং তাই হলো প্রকৃত মার্কসীয় ঐতিহ্য। এই পরিবর্ত্তনশীল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টীভঙ্গীর উপরই

মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠিত। এবং এরই উপর গোড়ে তুলতে হয়ে ভবিষ্যতের দর্শন ও আদর্শ।

ইতিহাসের মার্কসীয় বিশ্লেষণ চিরস্থায়ী স্থির নয়। মার্কসরাদ বলে যে, নূতন নূতন অবস্থার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসেরও নূতন ভাবে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়। এই পরিবর্ত্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গীই মার্কসবাদের বিশেষত্ব এবং তাই মার্কসবাদকে কোন বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার দর্শন বা ইতিহাস হিষাবে গণ্য করলে ভুল হবে। মার্কসবাদ কোন বিশেষ দার্শনিক মতবাদ বা সূত্রাবলী অথবা বিশেষ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মত বা পথ নয়। মার্কসবাদ হলো দর্শন ও ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক রূপ, যুক্তিবাদ হলো এর বনেদ ; সময়ের সাথে সাথে ইহা নিজেকে পরিবর্ত্তন করে এবং নূতন অবস্থা অনুযায়ী তার পূনর্বিচার করে। ঠিক এই সম্বন্ধে মার্কসের সহকর্ম্মী এঙ্গেলস্ পল আর্ণষ্টকে একটি চিঠিতে লেখেন "মার্কস দর্শন বলে যে, প্রত্যেক অবস্থায় ইতিহাসকে নূতন ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করতে হবে।" এই বিষয়ে কনরাড স্মিডকে ও অন্যান্য কয়েক জনকে কয়েকটি চিঠিতে এঙ্গেলস ঠিক এই পরিবর্ত্তনশীল যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

মার্কসই প্রথম প্লেটোর মানববাদকে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে তোলেন। মানুষই যে সমাজের মূল এবং সমাজব্যবস্থার এবং সভ্যতার মাপকাঠি— প্লেটোর এই দার্শনিক পর্য্যালোচনা হলো মার্কসদর্শনের মূল ভিত্তি। তাই প্রত্যেকটি মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি ও উন্নতির এক বিরাট অস্ত্র—মার্কস দর্শন। জগতকে চিরপরিবর্ত্তনশীল হিসাবে গণ্য করে মার্কস বলেন যে, পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থির নয়। পরিবর্ত্তনই বিশ্বজগতের প্রকৃতি ; কিন্তু এই পরিবর্ত্তন সাধনে মানুষেরই পুরো দায়িত্ব এবং কারুকার্য্যতা আছে। তাই মানুষ নিজেই যেমন সমাজকে আদিম অবস্থা থেকে আজকের এই

সভ্যতর উন্নততর অবস্থায় নিয়ে এসেছে আজও মানুষই তেমনি জগতকে এবং সমাজকে এই অবস্থা থেকে আরো উন্নত ও সভ্যতর অবস্থায় নিয়ে যাবে। সে ক্ষমতা মানুষের আছে; এবং মানুষ যেমন জগতকে পরিবর্ত্তন করতে সক্ষম—সেই সঙ্গে সঙ্গে সে তার নিজের ভাগ্য অর্থাৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে পরিবর্ত্তন করতেও সক্ষম। এইখানেই মার্কস্ দর্শনের সঙ্গে অন্যান্য দর্শনের পার্থক্য। এবং তাই মার্কসবাদ মানুষের জীবনের দর্শন।

প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি যতদিন অটুট থাকবে, যে দর্শনের মূল হলো দেশ বা জাতি বা অন্য কোন অলৌকিক বা অপ্রাকৃতিক সংজ্ঞা, ততদিন মানুষের মনে এ বিশ্বাস, এ সংকল্প আসবেনা যে, সে নিজেই তার ভাগ্যবিধাতা এবং ইচ্ছামত সে তার জীবন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে পরিবর্ত্তন করতে পারে। মার্কসবাদ মানুষকে সেই দর্শনে উৎসাহী করে, অনুপ্রেরনা দেয় যা তার জীবনের দর্শন, যার সাহায্যে সে এই পরিবর্ত্তন আনতে পারবে। তার জন্যে প্রয়োজন প্রচলিত দর্শনের পরিবর্ত্তে যুক্তিবাদী এবং বৈজ্ঞানিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করা—যা যতকিছু অপ্রাকৃতিক, কাল্পনিক সব দূর করবে। এই সব মিলিয়েই মার্কসবাদ।

মার্কসবাদ, শুধু অর্থনীতি, শুধু রাজনীতি অথবা শুধু দর্শন কিম্বা ইতিহাসের বিবরণ নয়। মানুষের জীবনের এবং জগতের সব কিছু নিয়েই মার্কসবাদ—সমাজকে ক্রমাগত উন্নততর ও সভ্যতর অবস্থায় নিয়ে যাবার এক প্রধান অস্ত্র; এবং একমাত্র এইদিক দিয়েই, চিরপরিবর্ত্তনশীল সামাজিক দর্শন হিসাবে গণ্য করলে তবে মার্কসবাদের প্রকৃত তথ্য উপলব্ধি করা যাবে।

মার্কসবাদ মানুষকে নূতন করে তার সমাজ, তার সংস্কৃতিকে গোড়ে তুলতে এবং তার জন্মগত বেঁচে থাকবার অধিকার ও সুখে থাকবার সুযো

পেতে সাহায্য করে এবং অনুপ্রেরণা দেয়। মানুষের উন্নতি, সভ্যতা, সংস্কৃতির একমাত্র আধার—পরিবর্ত্তনের প্রতীক, মানুষের জীবনের এই দর্শন—মার্কসবাদ। মার্কসবাদ কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বাধীনতা সংগ্রামের আধার নয় বা দর্শন নয়, অথবা ইতিহাসের শুধু অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা নয়, মার্কসবাদ সমগ্র মানব জীবনের দর্শন—জ্ঞান ও প্রগতির প্রতীক। যুগে যুগে মানুষকে উন্নত থেকে উন্নততর করবার জগতকে, সমাজকে সভ্যতর করবার, সভ্যতা ও সাম্যের পূর্ণ বিকাশের আধার; ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক রূপ ও দর্শন, মার্কসবাদ মানুষকে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার এবং পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দেয়, পথ প্রদর্শক হয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়।

শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে মানবেন্দ্রনাথ মার্কসবাদের এবং বৈজ্ঞানিক দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত; ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম মার্কসবাদ প্রচার করেন। তাই আজ যখন মার্কসবাদ কি, এই নিয়ে এত বাক-বিতণ্ডা চলছে, তখন এ সম্বন্ধে মানবেন্দ্রনাথের মত জানা সবথেকে প্রয়োজন; তাই মানবেন্দ্রনাথের মার্কসবাদ সম্বন্ধীয় কয়েকটি লেখা অনুবাদ করে এই বইটি প্রকাশ করা হলো।

বেহালা। সমরেন রায়
৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৩।

মার্কসবাদ।

মার্কস্‌বাদ বলতে সাধারনত আমরা বুঝি যে ইহা এক বিশেষ ধরনের রাজনীতি বা অর্থনৈতিক সূত্রাবলী। যদিও অর্থনীতি এবং রাজনীতি মার্কস্‌বাদের অন্তর্ভূক্ত, তবুও ইহারা শুধু মার্কসবাদের অংশবিশেষ। প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদ একটি দর্শন। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা সঙ্কীর্ণ, বদ্ধ আদর্শ বা চিন্তাধারা নয়; বা শুধু কতকগুলি সূত্রের সমষ্টি নয়; মার্কস দর্শন এক বিশেষ প্রাণালী। অনেকের মতে, মার্কসবাদ হচ্ছে মানব ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিশ্লেষন ও বিবরণ। কিন্তু ইহাও সঠিক নয়। ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিবরণ বলতে সাধারনত যে সঙ্কীর্ণতা বুঝায়, মার্কসবাদ ইতিহাসকে সেই সঙ্কীর্ণতা থেকে উদ্ধার করেছে। মার্কসবাদ, প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাসের বস্তু-তান্ত্রিক বিবরণ; কিন্তু বস্তুবাদ মানে "খাও, দাও, নৃত্য কর" এই আদর্শ নয়। অর্থনৈতিক পদ্ধতি, রাজনৈতিক আদর্শ ও কার্য্যসূচী এসব নিয়েই মার্কস্‌বাদ গঠিত; কারণ, মার্কসবাদ মানব-জীবনের দর্শন এবং সেই হিসাবে মানুষের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রই মার্কস্‌বাদের অন্তর্ভূক্ত।

মার্কস দর্শন বস্তুতান্ত্রিক দর্শন। কিন্তু মার্কসীয় বস্তুবাদ প্রচলিত বস্তুবাদের ধারনা থেকে পৃথক। প্রথমেই একটা কথা

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মার্কস্‌বাদ প্রাগ্‌জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান জনিত আদর্শ নয়, বা শুধু কার্ল মার্কসের মানসিক প্রতিভার বিকাশ নয়। মার্কস্‌বাদের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য এবং বৈশিষ্ঠ এই যে, কার্ল মার্ক্‌সের পূর্ব্বে তিন চার শতাব্দীর সমগ্র মানব চিন্তাধারা ও কার্য্যকলাপের ইহা এক সমষ্টিগত বৈজ্ঞানিক বিবরণ। পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দিতে ইউরোপীয় সমাজ যে বিরাট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, সেই দার্শনিক এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবই অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করে। এই বিপ্লবেরই প্রত্যক্ষফল মানব সভ্যতার নবজাগরণ। এর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত মানুষের চিন্তা একই ধারায় বদ্ধ ছিল। তার উন্নতির সব আশাই শেষ হয়ে যায়। সেই চিন্তাধারা মানুষকে রহস্যবাদ এবং ঈশ্বরবাদে মগ্ন করে রাখে। সমাজের উন্নতির জন্য মানুষকে অন্ধবিশ্বাসের মোহ এবং ধর্ম্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করার প্রয়োজন হয়। গ্যালিলিও ও কপারনিকাস প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারের ফলেই তা সম্ভব হয়।

মার্কসবাদকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে দর্শনের সূত্র থেকেই শুরু করা কর্ত্তব্য। দর্শন কি—এ বিষয়ে বহু মতভেদ আছে; এবং কোনও দুজন দার্শনিকই এ বিষয়ে একমত নন। কিন্তু আমরা যদি দর্শনের ইতিহাস অধ্যয়ন করি তা হলেই একমাত্র বুঝতে পারি যে পরিচিত সংজ্ঞা দিয়ে বিশ্বজগতের বিশ্লেষণই হচ্ছে দর্শন। প্রাচ্যের এবং পাশ্চাত্যের দর্শনমাত্রেরই ভিত্তি হচ্ছে যুক্তিবাদ। মানুষের স্থিতি এবং তার সামাজিক পরিবেশের অর্থ-

নিরূপণের প্রচেষ্টাতেই দর্শনের সুরু। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যতিরেকে পদার্থিক জগতের পরিবেশ এবং তন্মধ্যস্থিত কার্য্যকলাপের পদার্থিক সংজ্ঞাদিয়ে কোনও প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, তাই আদিম কালে বিশ্বজগতের বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য হয়।

কিন্তু মানুষ স্বভাবত প্রত্যেক ব্যাপারেরই কোন কারণ নির্দ্ধারণ না করে ক্ষান্ত হতে পারে না। যখন মানুষ কোনও ঘটনার কোন কারণ খুঁজে পায়না তখন সে তার কোনও বিশেষ কারণ নির্দ্ধারণ করে থাকে। মানুষ যে প্রত্যেক ঘটনারই কারণ খুঁজে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই জন্যই ধর্ম্মের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় তাতে করেই প্রমাণ হয় যে মানুষ যুক্তিবাদী। অন্তরে অন্তরে মানুষ ইহা বিশ্বাস করে না যে, শূন্য থেকে কিছুর সৃষ্টি হতে পারে। প্রত্যেক ঘটনারই কোন না কোন কারণ আছে এবং কোনও ঘটনার কারণ না জানলে তাকে অবাস্তব অলৌকিক শক্তির বিকাশ বলা হয়। কোনও ঘটনার সঠিক কারণ নির্দ্ধারণ করার অক্ষমতাই ঐশ্বরিক অলৌকিক কারণ নির্দ্দেশের মূল ; তাতে করে এই বুঝায় যে আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা ইহা অপেক্ষা যুক্তিযুক্ত কারণ নির্দ্দেশ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই এটা তার একটা কারণ খুঁজে বার করার প্রচেষ্টা। এই সব অলৌকিক অবাস্তব সংজ্ঞা—যাকে আমরা ঈশ্বর বা মূল কারণ বা মূল তত্ত্ব বলে থাকি, সবই বীজগণিতের অজানা অঙ্কের সমতুল। কোনও অজানা সংজ্ঞাকে আমরা বিশেষ এক আখ্যা দি,

এবং তারপরে সেই অজানা সংজ্ঞার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করতে প্রবৃত্ত হই।

যে সব সমস্যা ভারতীয় এবং ইউরোপীয় দর্শনে দুহাজার বৎসর পূর্ব্বে উত্থাপিত হয়েছিল—ইউরোপীয় সমাজ ষষ্টদশ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে তাদের সমাধান করতে প্রবৃত্ত হয়। আধ্যাত্মিক এবং মানসিক উৎকর্ষতার এই নূতন যুগ আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সম্ভব হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ অলৌকিক অনুমান ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। যে সব ঘটনার কারণ পূর্ব্বে অলৌকিক, ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাব বলে কল্পনা করা হোত—তার মধ্যে অনেকের সঠিক বাস্তবিক কারণ নির্দ্ধারণ করতে পদার্থ বিজ্ঞান সাহায্য করে। এই নূতন আবিষ্কারের ফলে এক নূতন দর্শনের সৃষ্টি হয়—যার মধ্যে অতীন্দ্রিয় অনুমান এবং গূঢ় রহস্যের কোনও স্থান থাকেনা; বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই দর্শন হচ্ছে মার্কসবাদ। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মূল কথাই এই যে কোনও কিছুই বিনা যুক্তিতে বা বিনা বিচারে গ্রাহ্য করা চলে না। যদি কোনও বিষয় অনুসন্ধানের জন্য সূত্রের প্রয়োজন হয় তো তাকে অনুমানের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মৌলিক গবেষনার দ্বারা কোন অনুমানকে প্রতিষ্ঠা করাই বৈজ্ঞানিকদের কাজ। গত ১০০০ বা ১২০০ বৎসর পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় যে ধর্ম্মাত্মক প্রভাব ছিল আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকেরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা তা বিনষ্ট করেন।

যুক্তিবাদী দর্শন একমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্যেই বহির্জগতের বিষদ বিবরণ দিতে সক্ষম। দর্শনকে নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ চিন্তাধারা করতে গিয়ে, যেখানেই কোনও বিষয়ের সমাধান বিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব হয়নি—সেখানেই আধুনিক দার্শনিকগণ অতীন্দ্রিয় অনুমানের সাহায্য নেন। কার্ল মার্কসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আধুনিক দর্শন এই বিপাকে পড়েছিল। ইহার কারণ ছিল এই যে পূর্ব্বেকার অলৌকিক সংজ্ঞাগুলি অস্বীকার করে ইহা আবার এক নূতন অলৌকিকতার সৃষ্টি করে। ইহার মধ্যে বিশিষ্ট হচ্ছেন ইমানুয়েল কাণ্ট।

কাণ্টীয় দর্শন "সর্ব্ববিধ্বংসী" বলে বিখ্যাত। কাণ্ট যা কিছু পুরাতন তা সমস্ত ধ্বংস করে তার পরিবর্ত্তে এক নূতন অলৌকিকতার সৃষ্টি করেন। কিন্তু শুধুমাত্র বিজ্ঞানের অপ্রসারতাই ইহার একমাত্র কারণ নয়। প্রকৃত কারণ হচ্ছে জ্ঞানতত্ত্বের মৌলিক সিদ্ধান্তে কতকগুলি ত্রুটী। যা কিছু অপ্রয়োজনীয় তা সমস্তই পরিত্যাগ করতে গিয়ে আধুনিক দর্শনের প্রবর্ত্তকেরা চিন্তাশক্তি এবং মানসিক বিকাশের প্রভাবকে অত্যন্ত ন্যূন জ্ঞান করেন। এমন কি মনকে মস্তিস্ক (brain) হতে নিঃসৃত এক বস্তু হিসাবে অনেকে বর্ণনা করেন। এতে করে জ্ঞানতত্ত্বের প্রধান সমস্যা—মানুষের জ্ঞানর্জ্জন কি ভাবে হয়, দার্শনিকদের সেই সমাধান করতেই সচেতন কোরে তোলে। এই সমস্যা একরকম সকলকেই চিন্তাগ্রস্থ করে এবং কোনও রকম বৈজ্ঞানিক উত্তর বা সমাধান না পাওয়ায়, অদ্ভুত অদ্ভুত কাল্পনিক মতের সৃষ্টি হতে থাকে।

মার্কস্ শুধু যে এর সমাধান করেই পুরাতন দর্শনকে ধ্বংস করেন তা' নয়; মার্কস্ এ পর্য্যন্ত বলেন যে, মানুষের ভাব ও বাস্তব সত্য এবং মৌলিক সংজ্ঞা।

ফলে বাদানুবাদ গিয়ে পৌঁছায় এখানে যে, মৌলিক সত্য মন না দেহ, অর্থাৎ বস্তু না আত্মা। পূর্ব্বতন বস্তুবাদীরা মনের অর্থাৎ ভাবের বাস্তবতা অস্বীকার করেন। বাস্তব বলতে যার অস্তিত্ব আছে তাহাই বুঝায়। মানুষের ভাবের ও যে বাহ্য অস্তিত্ব আছে বস্তুবাদীদের মধ্যে প্রথম মার্কসই তা স্বীকার করেন। মার্কস্ বলেন যে একবার সৃষ্টি হওয়ার পর, মানুষের ভাব ও অন্যান্য জড়বস্তুর মত বাস্তবে পরিণত হয়।

সমস্ত মতদ্বৈধতার মধ্যে ইহা এক নূতন পথ দেখায়। ভাব এবং বস্তুর মধ্যে আর কোন বিরোধবোধ থাকেনা। কোনটী প্রথম—ভাব না বস্তু, এ বিষয়ে মার্কস্ কোনও অযৌক্তিক বা কল্পনামূলক উত্তর দেননি। তিনি মানুষের চিন্তাধারার এবং ভাবের ক্রমোন্নতিকে বিশদ এবং বিস্তৃত বিচার করেন। এ বিষয়ে তিনি যে সর্ব্বপ্রথম প্রচেষ্টা করেন তা নয়। মার্কস দর্শনের অগ্রদূত হেগেলই প্রথম এই কার্য্যে ব্রতী হন। হেগেলই প্রথম দর্শনের একটা সুসংবদ্ধ ইতিহাস লেখেন এবং এই উপসংহারে উপনীত হন যে দর্শনের ইতিহাসই মানব সভ্যতার ইতিহাস। হেগেল বলেন যে, ভাব চিরকালই আছে, এবং ভাবের আত্মানুভূতিই হলো জড় জগৎ। মার্কস্ প্রশ্ন তোলেন যে, ভাবের সৃষ্টি কি ভাবে হয়? প্রাচীন

যুগে যখন মানুষের মন ধর্ম্মভ'াপন্ন ছিল, তখন এ প্রশ্ন অবান্তর ছিল। কিন্তু বিজ্ঞান ও যুক্তির যুগে এ প্রশ্ন অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত এবং এর উত্তরের প্রয়োজন আছে। যদি ইহাই সত্য হয় যে দর্শনের ইতিহাসই মানব সভ্যতার ইতিহাস, তাহলে মানব সভ্যতার ইতিহাসের অর্থাৎ সামাজিক বিবর্ত্তনের মূল কারণ হয় ভাবের আদি কারণ। ভাব একবার সৃষ্টি হলে, মানুষের চিন্তাশক্তি এবং সভ্যতার প্রগতি সেই ভাবেরই বশীভুত। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে ভাবের সৃষ্টি কি ভাবে হয়? এই প্রশ্নের উত্তরই সামাজিক বিবর্ত্তনের মূল সূত্র বা মূল কারণ নির্দ্ধারণ করতে সক্ষম হবে।

নৃতত্ত্বের এবং প্রত্নতত্বের সাহায্যে সমাজের সৃষ্টির ইতিহাস অনুসন্ধান করে মার্কস্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মানুষের জীবনধারণের উপায়ের উপরই তার চিন্তাধারা নির্ভর করে, এতে করে সমস্ত সমস্যাই খুব সরল হয়ে দাঁড়ায়। হয়ত সকল দার্শনিকই মার্কস দর্শনকে পুরোপুরি মানেন না; কিন্তু আজ কোনও খ্যাত-নামা দার্শনিকই, বৈজ্ঞানিকের কথা দূরে থাক, একথা অস্বীকার করবেন না যে আমাদের ব্যবহার, আমাদের চিন্তাধারা, আমাদের বিশ্বাস সবই, আমাদের সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে আর কোন দ্বিমত নেই। প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক ঘটনার মতো এ আমাদের কষ্ট করে গবেষণা করে বার করতে হবেনা; পৃথিবীর সমস্ত দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রা থেকেই আমরা ইহা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর বিভিন্ন

দেশে, বিভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন ভিন্ন মত ও সামাজিক নিয়মানু-বর্ত্তী। এই সমস্ত পার্থক্যই যে নির্ভর করে তাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের প্রণালীর উপর, অভিজ্ঞতার দ্বারাই তা প্রমাণ হয়েছে। মার্কসের এই গবেষণার পর জ্ঞানবিজ্ঞানের অর্থাৎ কি ভাবে জ্ঞানার্জ্জন হয়, সৃষ্টিতত্ত্বের এই আদিম সমস্যাটির সমাধান হয়। এর দ্বারা আমরা মানব ইতিহাসের এবং সভ্যতার মূল কারণে উপনীত হই—যাতে করে ইতিহাস এবং প্রগতির প্রত্যেকটী ব্যাপার আমরা জানতে পারি। মার্কসীয় রাজনীতি বা মার্কসীয় অর্থনীতিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করি তার নামই মার্কসীয় দর্শন। আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সেই সব সমস্যার সমাধান করে থাকি; সেই দৃষ্টিভঙ্গি বা আদর্শই হচ্ছে মার্কসবাদের মূলতত্ত্ব—বস্তুবাদ।

এই উপসংহারে উপনীত হয়ে মার্কস দর্শনের এক নূতন সংজ্ঞা দিলেন যে জগতকে বিশ্লেষণ করাই দর্শনের কাজ নয়, জগতকে নূতন করে গড়ে তোলাই দর্শনের কাজ। এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দর্শন কেবল মাত্র কল্পনার আধার ছিল। মানুষ এবং পৃথিবীকে বিশ্লেষণ করাই ছিল ইহার কাজ, প্রচলিত সমাজ এবং পৃথিবীকে মেনে নিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য; কিন্তু একথা দর্শন কখনও তোলেনি যে সমাজ ব্যবস্থা কেন এরকম থাকবে বা কেন এ রকম হয়েছে। বস্তুজগৎ এবং তার নিয়মাদিকেই একমাত্র প্রচলিত ব্যবস্থা বলে ধরে নিয়ে দর্শন সেই ব্যবস্থাকেই

বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু কেন এই ব্যবস্থা প্রচলিত তার কারণ পূর্ব্বেকার দর্শন অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেনি; এবং যদিও বা কখনও তার কোনও প্রচেষ্টা হয়েছে তাও অলৌকিক কল্পনাতেই পরিণত হয়; আর শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত সমাধানই গিয়ে দাঁড়ায় ঐশ্বরিক শক্তি অথবা ঐশ্বরিক প্রয়োজনে।

এই পুরানো ধারণা অনুযায়ী, দর্শনের সঙ্গে জীবনের কোনও সম্বন্ধ নেই; এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে দার্শনিক-দের কোনরূপ চিন্তা করারও প্রয়োজন নেই। তাঁরা কেবল প্রকৃতি এবং জীবনের বৈচিত্র্য নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। প্রত্যেকেই কোন না কোন অবস্থা থেকে সুরু করেন এবং একবার কোনও বিশেষ অবস্থা থেকে সুরু হলে পরবর্ত্তী সমস্তই যথারীতি ঘটে যায়। দার্শনিক চিন্তাধারার এই মূল প্রতিজ্ঞাটির সত্যতা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম মার্কস্ সন্দেহ প্রকাশ করেন। মার্কসবাদ অনুযায়ী মানুষ জগতের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করতে পারে তার কারণ জগতের গঠনে মানুষের পুরো দায়িত্ব এবং কারুকার্য্যতা আছে। আমরা যদি জগতকে নূতন করে গড়ে তুলতে সক্ষম হই, তাহলে ইহা স্বতসিদ্ধ যে, আমাদের পূর্ব্বে মানুষই আজকের পৃথিবীকে এইভাবে গোড়ে তুলেছে। মানুষ যে নিজের সুবিধামত এবং মনোমত জগতকে পুনর্গঠন করতে পারে এই ধারনা মানুষকে সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক বন্ধন থেকে মুক্ত করে এবং ধর্ম্মাত্মক চিন্তাধারা ও অন্ধ বিশ্বাসের মোহকে সমূলে ধ্বংস করে। তত্ত্বজ্ঞানজনিত দর্শন ধর্ম্মের

গোঁড়ামী বিনষ্ট করে তার পরিবর্ত্তে এক নূতন অদৃষ্টবাদ প্রতিষ্ঠা করে। বস্তুতঃ মার্কসের পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুবাদ আসলে অদৃষ্টবাদই ছিল। এই মতানুযায়ী মানুষ তার সামাজিক পরিবেশের অধীন এবং এই পরিবেশ পরিবর্ত্তন করায় মানুষের যদিও কোনও হাত নেই তবু সে যা করে এবং যা ভাবে তা সমস্তই এই পরিবেশের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীটা এক বিরাট কারাগার; এ থেকে নিস্কৃতি পাবার উপায় নেই এবং এই কারাগার এমন এক অদৃশ্য অপরিমিত শক্তিদ্বারা পরিচালিত যাকে পূর্ব্বে ঈশ্বর আখ্যা দেওয়া হতো এবং এখন বলা হয় বস্তু।

প্রকৃতপক্ষে মার্কসীয় দর্শনে মানুষই ঈশ্বরের স্থান অধিকার করেছে। মার্কস যা বলেছেন তা মোটেই অযৌক্তিক নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেন যে মানুষের ভাব, আদর্শ, বিশ্বাস এবং ব্যবহার, তার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ সব কিছুই নির্ভর করে তার সামাজিক পরিবেশের উপর। কিন্তু তারই মধ্যে মানুষ সেই পরিবেশকে তার নিজের সুবিধামত পরিবর্ত্তন করতে সক্ষম। জীবনযাত্রায় সে যে কেবল মাত্র অভিনেতা এবং তার সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের কোনও নিগূঢ় সম্বন্ধ নেই তা নয়, এই জীবনযাত্রার এবং পরিবেশের সে একটী বিশেষ অংশ। কিন্তু তার নিজের আচার ব্যবহার সবই নির্ভর করে তার পরিবেশের উপর। সুতরাং মানুষ যে শুধু তার নিজের পরিবেশ এবং সত্ত্বাকেই পরিবর্ত্তন করতে পারে এবং সেখানেই শুধু যে সে নিজে

কর্ত্তা তা নয়, মানুষ ইতিহাসকেও নূতন করে গোড়ে তুলতে পারে ইহাই মার্কসবাদের সার কথা।

ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ভাষ্যের দ্বারা মার্কস্ সমাজ বিবর্ত্তনের ইতিহাস নূতন করে রচনা করেন। এতদিন পর্য্যন্ত ইতিহাস ছিল শুধু গল্প কথা; কতকগুলি খাপছাড়া ঘটনার সমাবেশ; ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবেও তাদের সত্যতা ছিল অত্যন্ত সন্দেহজনক। কেউ লিখলেন কোনও এক সময়ে কোনও বিশেষ স্থানে এক যুদ্ধ হয়; রচয়িতার এবং ঘটনার সত্যতা আমাদের শুধু নিঃসন্দেহে মেনেই নিতে হতো। কিন্তু সেই যুদ্ধ যে ঠিক সেই সময় বা সেই স্থানে ঘটে ছিল তার কোনও সঠিক প্রমান নেই। যতদিন না মার্কস্ ইতিহাসের এই সার তথ্য নির্দ্ধারন করেন ততদিন ঐতিহাসিক জ্ঞানও প্রকৃত জ্ঞান ছিলনা, কেবল মাত্র, একটা অন্ধ বিশ্বাস ছিল। বইয়েতে কিছু লেখা থাকলেই আমরা পড়তাম এবং তা মেনে নিতাম। কিন্তু মার্কস্ দেখালেন যে ইতিহাসও একটা বিজ্ঞান এবং এ সম্বন্ধেও গবেষনা ও অনুসন্ধান করার প্রয়োজন। প্রাকৃতিক ঘটনাও যেমন বিনা কারণে কিছু ঘটে না, সেই রকম মানব সমাজের ইতিহাসেও বিনা কারনে কিছু ঘটেনা; প্রত্যেকটি ঘটনাই পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার উপর নির্ভর করে; হঠাৎ বিনা কারণে কিছুই ঘটেনা।

মার্কসই প্রথম ইতিহাসের এই মূলতত্ত্ব নির্দ্ধারণের সন্ধান দেন। মার্কস বলেন যে, মানুষের ভাব শুধু তার সামাজিক পরিবেশের উপরই নির্ভর করে না, তার জীবিকার্জ্জনের

উপায়ের উপরও নির্ভর করে। মানসিক সত্বা মানুষের দৈহিক অস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত। যে ভাবে মানুষ তার জীবসত্বাকে রক্ষা করে তারই উপর তার আর সব সত্বা নির্ভর করে। কোন বিশেষ উপায়ে জীবিকার্জ্জন সুরু করলে, তাতেই যে চিরকাল মানুষ ব্যাপৃত থাকবে, তার কোন কারণ নেই। মানুষ তার জীবিকার্জ্জনের উপায়ও পরিবর্ত্তন করতে পারে। কুম্ভকার চিরকালই কুম্ভকার না থাকতেও পারে। যে শক্তির সাহায্যে আদিম কালে মানুষ হাতুড়ি তৈরী করতে শেখে সেই শক্তির সাহায্যেই পরে সে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র তৈরী করতে সক্ষম হয়। এই নূতন যন্ত্র উৎপাদন প্রণালীকে পরিবর্ত্তন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমস্ত আধ্যাত্মিক এবং মানসিক ভাব ও পরিবর্ত্তিত হয়। এই ভাবে উত্তরোত্তর উন্নততর উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাব ও আদর্শ সবই উন্নত হ'তে থাকে। এই সব পরিবর্ত্তনই সামাজিক বিবর্ত্তনের এক একটী ধাপ।

ইতিহাসের এই মৌলিক তথ্য নির্দ্ধারণ করে মার্কস্ তার নিজের সময়কার সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখেন যে সেই সমাজব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক। তিনি প্রমাণ করেন যে এই ব্যবস্থায় কৃষ্টি, কলা, আচার ব্যবহার সবই নির্ভর করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর উপর। তিনি আরও প্রমাণ করেন যে ইহার পূর্ব্বেকার ঐতিহাসিক যুগের মানুষের সমস্ত উৎকর্ষতা, তার চিন্তাধারা এবং মানবজাতির যতকিছু আধ্যাত্মিক প্রতিভা ও অবদান সবই ছিল সামন্ত প্রথার অর্থাৎ জমিদারী প্রথার উৎপাদন প্রণালী

দ্বারা নির্দ্ধারিত। সেই ব্যবস্থা যখন নিঃশেষিত ও অকেজো হয়ে পড়ে তখনই ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার মধ্যেই বেড়ে উঠে সেই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ধনতন্ত্র এক নূতন সমাজ ও সংস্কৃতি এবং নূতন রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর উন্নতি ও সহযোগিতার জন্য এই পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়। পরিশেষে মার্কস্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এইসব পরিবর্ত্তন ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ ঘটে আসছে এবং আজ পর্য্যন্ত বহুবার এইসব পরিবর্ত্তন ঘটেছে। যদি ইতিহাস শেষ পর্য্যায়ে না পৌঁছে থাকে তবে ঠিক পূর্ব্বেও যেমন মানুষ এই সব পরিবর্ত্তন সাধন করেছে পরেও তেমনি করবে। যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্টি, কলা, আচার ব্যবহার ভাব ও দর্শনকে ধনতান্ত্রিক আদর্শে পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন হয় তেমনি ধনতান্ত্রিক সমাজ এবং আদর্শের পরিবর্ত্তে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন সমাজ ও আদর্শ, নূতন উৎপাদন প্রথা, নূতন মানব সভ্যতা, কৃষ্টি ও কলা, ভাব ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হবে।

কার্ল মার্কস্ বলেন যে ইতিহাস ফরমাস দিয়ে তৈরী করা যায় না; প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই যে সব উপাদান আছে তা দিয়েই আমাদের সমাজকে নূতন করে গড়তে হবে। প্রতিষ্ঠিত সমাজের জীবাণুই নূতন সমাজ সৃষ্টি করবে। অনেকের মতে মার্কসবাদী হতে হলে একমাত্র সাম্যবাদী সমাজ ছাড়া অন্য কোনও সমাজ ব্যবস্থার চিন্তা করার বা তার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টার

প্রয়োজন নেই। কিন্তু মার্কস্ শুধু এই কথাই বলেছেন যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকেই সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে এবং তাই ধনতন্ত্রের পর সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেছেন যে আমাদের জ্ঞান এবং ইতিহাসের সাহায্যে আমরা যতদূর দেখতে পাই, তাতে আমরা এই জানতে পারি যে, ভবিষ্যৎ সমাজ সাম্যবাদের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেখানেই সব শেষ হয়ে যাবে। তবে আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের সাহায্যে আমরা তার পরের ব্যবস্থা কল্পনা করতে পারি না। মার্কস্ একথা পরিষ্কার করে বলেন যে ধনতন্ত্রের পর সমাজ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে; সুতরাং যদি আমাদের দেশে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তাহ'লে সমাজতন্ত্র অবশ্যম্ভাবী। তবে যদি আমরা দেখি যে আমরা এখনই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারিনা কারণ যে সব উপাদান সাম্যবাদের জন্য প্রয়োজন তা নেই, তাহ'লে প্রকৃত মার্কসবাদী হিসাবে আমাদের সেই সব উপাদানের সৃষ্টি করতে হবে; সেই ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কার্ল মার্কস্ নিজে যখন "সাম্যবাদের খসড়া" (Communist manifesto) রচনা করেন তখন যদিও তিনি জানতেন যে ধনতন্ত্রের ধ্বংসের পর সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে তবুও তিনি রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ এবং ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেন।

মার্কসবাদ এবং সাম্যবাদ এক ইহা অত্যন্ত ভুল ধারনা।

মার্কসবাদের সাহায্যেই সাম্যবাদের রূপ প্রকাশ প্রায় কিন্তু মার্কসবাদ সাম্যবাদ অপেক্ষা অনেক বড়। মার্কসবাদ শুধু সাম্যবাদেরই দর্শন নয়; সমগ্র মানব সভ্যতা, সমাজ বিবর্ত্তন, সবই মার্কসবাদের অন্তর্ভূক্ত।

আজ যদি আমরা এমন এক সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পড়ি যেখানে সমাজ সবে আদিম সাম্যবাদ থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সে অবস্থায় মার্কসবাদ অনুযায়ী আমাদের কর্ত্তব্য সেই বিবর্ত্তনকে সাহায্য করে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাহায্য করা। কারণ একবার সেই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হ'লে আমরা তখন সেই ব্যবস্থার মধ্যে থেকে তার পরবর্ত্তী ব্যবস্থার বনেদ তৈরী করতে সক্ষম হবো; এবং মার্কসবাদী হিসাবে সুদূর প্রসারিত দৃষ্টি থাকার দরুন এবং পরবর্ত্তী ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা থাকায় সেই প্রক্রিয়াকে সরল নির্দ্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় পথে সচেতনভাবে পরিচালিত করতে পারবো।

মার্কসবাদের ঠিক এই দিকটাই আমাদের দেশে অশ্রদ্ধেয়। যদি আমরা মার্কস্‌বাদ বলতে যুক্তিবাদী, ন্যায়সঙ্গত এবং বস্তুবাদী চিন্তাধারা বুঝি, কতকগুলি স্থির সিদ্ধান্তের সমষ্টি নয়, তা হ'লে আমরা মার্কসবাদী হ'য়েও যে কোন অবস্থাতেই বাস্তববাদীর মত কাজ করতে পারবো। কিন্তু যদি এই সব বাস্তবকে মেনে না নিই তাহলে আমরা প্রকৃত মার্কসবাদী হ'তে পারবো না; কারণ ভবিষ্যত কার্য্যসূচী সবই ভ্রান্ত আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হবে

এবং আমরা ঠিকভাবে বিচার করতে বা পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে দ্রুত পৌঁছাতে সক্ষম হব না।

মার্কসবাদ, শুধু কতকগুলি স্থির নির্দ্দেশের সমষ্টি নয়। মার্কসবাদীকে কয়েকটী স্থির সূত্রকেই চিরন্তন সত্যবলে মেনে নিতে হয় না। মার্কসবাদ জীবনের দর্শন কিন্তু তাতে শুধু সাম্যবাদীর জীবনই বুঝায় না বুর্জ্জোয়ার জীবনের সঙ্গে'ও এর সম্বন্ধ আছে। মার্কসবাদ আমাদের সামনে মানব সভ্যতার বিবর্ত্তনের ইতিহাসকে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করেছে। মার্কসবাদে বিবর্ত্তনের শেষ কোথাও নেই, তাই আমাদের পক্ষে মার্কস যা বলে গেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করারও প্রয়োজন নেই। মার্কসবাদীর পক্ষে আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে মার্কসের শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি সব কিছুরই পুনরায় বিচার বিশ্লেষন করে যদি প্রয়োজন হয় তো তা পরিবর্ত্তন করা শুধু যুক্তিসঙ্গতই নয়, একান্ত কর্ত্তব্য এবং তাহাই হচ্ছে প্রকৃত মার্কসীয় রীতি 'ক্যাপিট্যাল' রচিত হওয়ার পরই মানুষের জ্ঞান ও প্রতিভা শেষ হয়ে যায়নি। ইহার পর মানুষের জ্ঞান অনেক বেড়েছে এবং আজ যদি সেই জ্ঞান এবং মার্কসীয় প্রণালীর সাহায্যে আমরা বুঝি যে মার্কসদর্শনের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন এবং তখন যদি আমাদের সেই পরিবর্ত্তন করার সাহস না থাকে তাহ'লে বুঝতে হবে আমরা প্রকৃত মার্কসবাদী নই।

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের জীবন ও চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে। এই সব পরিবর্ত্তন এতই

বৈপ্লবিক যে, বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরও ধারণা হয়েছে যে বস্তু বাদের ভিত্তি বিনষ্ট হয়ে আবার তত্বজ্ঞানজনিত গনিতবিদ ঈশ্বরের যুগ সুরু হয়েছে। কিন্তু যদি মার্কসের রচিত বস্তুবাদের যুক্তি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি তাহলে আমরা এই সব নূতন পরমার্থবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতে পারবো না; কারণ মার্কসের সময়ের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি নূতন নূতন আবিস্কারের ফলে আজ ভ্রান্ত প্রমান হয়েছে। মার্কসের সময়ে কতকগুলি অখণ্ড ক্ষুদ্র কণার সমষ্টিকে বস্তু বলে কল্পনা করা হোত, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান সেই ধারণা বিনষ্ট করে। সুতরাং যদি আমরা মার্কসের সিদ্ধান্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করি তাহলে হয়তো আমরা গোঁড়া মার্কসবাদী হতে পারি কিন্তু মার্কসের ধারণা অনু-যায়ী প্রকৃত মার্কসবাদী হতে পারবো না কারণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছাড়া আমরা জড় জগতকে বিশ্লেষণ করতে পারিনা। আজ মার্কসবাদীদের কর্ত্তব্য গোঁড়া বস্তুবাদের মৌলিক সিদ্ধান্তগুলি আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে পরিবর্ত্তিত করা এবং সেই পরি বর্ত্তনের ফলেই বস্তুবাদ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

কয়েকটি আধুনিক বাস্তব সমস্যার জন্য মার্কসের চিরাচরিত পন্থা মেনে চলা অসম্ভব। এই মার্কসীয় পথ একশো বৎসর পূর্ব্বেকার ইউরোপীয় পরিস্থিতি এবং ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থার বিশ্লেষণের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় সমাজের বিশ্লেষণ মার্ক-সের রচনায় আমরা পাইনা। তার কারণ তৎকালীন ইউরোপে ভারত সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিলনা। সুতরাং একথা আমরা বলতে

পারিনা যে, ইউরোপীয় বিবর্ত্তনের যে ধারা মার্কস রচনা করে-ছিলেন তা ভারতেও প্রযোজ্য। এমনকি ইউরোপের বর্ত্তমান ঘটনাগুলিও মার্কসের পন্থা অনুযায়ী ঘটছেনা। নূতন নূতন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে যা মার্কস কল্পনা করেননি এবং যা বর্ত্তমান পরিস্থিতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

মার্কসবাদ উপলব্ধি করতে গেলে একমাত্র তৎকালীন ঐতি-হাসিক পরিস্থিতির ভিত্তিতেই তা করা যাবে। মার্কসবাদের ভিত্তি হচ্ছে যুক্তিবাদ। ইউরোপের জাগৃতি আন্দোলন (Renaissance movement) থেকেই মার্কসবাদের সৃষ্টি। মধ্য-যুগের চিন্তাধারা বর্জ্জন করে ইউরোপীয় সমাজ তিনশো বৎসর অন্ধকারে আলো খুঁজে বেড়িয়েছে; অবশেষে ইউরোপীয় সমাজ মার্কসদর্শন সৃষ্টি করে। সেই তিনশো বৎসরের জ্ঞানের সমষ্টি মার্কসবাদ। সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখলে অবশ্য মার্কসবাদের মধ্যে খুব বেশী কিছু একটা নূতনত্ব পাবোনা। মার্কসের পূর্ব্বেকার আরও অনেকের ইতিহাসের বিশ্লেষণে আমরা মার্কসবাদের পরিচয় পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে গিবনের "রোম সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন" (Decline and Fall of Roman Empire)। ইহা মার্কসের বহু পূর্ব্বে লেখা। ষষ্ঠদশ শতাব্দি থেকে উনবিংশ শতাব্দি পর্য্যন্ত যে চিন্তাধারা ও শিক্ষাধারা ইউরোপে চলে আসছিল তারই শেষ পর্য্যায় মার্কসবাদ।

মার্কসের পূর্ব্বে ইউরোপে দার্শনিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক —বড় বড় বিপ্লব ঘটে। এইসব বিপ্লবের ইতিহাস

আমাদের পড়তে হবে—শিখতে হবে ; এদের সামাজিক প্রতিফল, দার্শনিক আদর্শ এবং ভিত্তি আমাদের বুঝতে হবে। যে চিন্তাধারা এসব বিপ্লবের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তি ছিল, আমাদের দেশের আমূল পরিবর্ত্তনের জন্যও সেই সবের সৃষ্টি করতে হবে, যাতে করে বহু সংখ্যক জনসাধারণ মার্কসবাদ মেনে নেয় এবং মার্কসবাদকে বাস্তবে পরিণত করতে যত্নবান হয়। তাই আমাদের দেশে মার্কসবাদীকে এই সব বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রবর্ত্তক হিসাবে, জাগৃতি আন্দোলনের নেতা হিসাবে কাজে নামতে হবে। যে দার্শনিক বিপ্লব, সমাজের যে সব পরিবর্ত্তন, মার্কসের পূর্ব্বে সাধিত হয় এবং মার্কসবাদকে মানুষের চিন্তাধারার এক প্রয়োজনীয় রূপ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে—তারই অগ্রদূত হতে হবে আমাদের দেশের মার্কসবাদের প্রবর্ত্তকদের।

যাদের এতটুকু ন্যায় বোধ আছে, তাদের এবং অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেও অতি সহজে বোঝান যাবে যে, কি ভাবে শ্রমিকরা শোষিত হচ্ছে ; এবং সেই জন্যেই ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের প্রয়োজন। কিন্তু যত দিন সেই যুবকবৃন্দ ধর্ম্মাত্মক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় মগ্ন থাকবে ততদিন কার্য্যক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যাবেনা। যতক্ষন পর্য্যন্ত না মানুষ মার্কসবাদের এই মূল দার্শনিক তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, সে নিজেই তার ভাগ্যবিধাতা, জগৎকে সে ইচ্ছামত গোড়ে তুলতে পারে এবং মানুষের শক্তিই জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তি, ততক্ষন পর্য্যন্ত কাউকে সাম্যবাদী তৈরী করা যাবেনা। ইহার একমাত্র উপায় যুক্তিবাদ প্রচার করা এবং শিক্ষিত

যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা প্রচলন করা। আমরা আজও বেশ কল্পনা ও তত্ত্বজ্ঞানপ্রিয়। তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে মার্কসবাদ প্রচার করলে তার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। আজ আমাদের দেশে মার্কসবাদের একমাত্র মূল নীতিগুলিই প্রসার লাভ করতে পারে; এবং দর্শন হিসাবেও ইহা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, যদিও দার্শনিক ক্ষেত্রেই ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাধাপ্রাপ্ত হবে। মার্কসবাদের বিরুদ্ধে এই সব দার্শনিক যুক্তি গোঁড়া মার্কসবাদ দ্বারা খণ্ডন করা যাবেনা; তা করতে হবে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা দিয়ে। যুক্তিবাদই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ধর্ম্মের ভিত্তি প্রথম শিথিল করে, ভারতেও তার প্রয়োজন। ধর্ম্মাত্মক ভাব পরিত্যাগ না করতে পারলে মানুষ বুদ্ধি বিবেচনার সঙ্গে জীবনের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারবেনা। ইহা কিছুতেই কল্পনা করা যায়না যে, কোনও লোক যে ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, সে কার্ল মার্কসের একখানা বই পড়েই মার্কসবাদী হয়ে যাবে। ইহা শুধু অন্ধ বিশ্বাস। শ্রমিক শ্রেণী জীবনের অভিজ্ঞতার ফলেই সাম্যবাদী হয়। বুদ্ধিজীবির পক্ষে মার্কসবাদী হওয়া অনেক বেশী কঠিন। বুদ্ধিজীবির পক্ষে মার্কসবাদ সম্বন্ধে কোন মত গঠন করতে হলে মার্কসবাদের মুল তত্ত্বের সাথে সবিশেষ পরিচিত হতে হবে। মার্কসবাদ সম্বন্ধে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আমাদের দেশে কদাচ দেখা যায়। সুতরাং মার্কসবাদ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে হ'লে প্রথমেই, যে দার্শনিক আন্দোলনের ফলে মার্কসবাদের সৃষ্টি হয়, সে সম্বন্ধে শিক্ষা

করতে হবে। আমাদের জানতে হবে যে কেন মার্কসবাদ বিপ্লবের এবং মানব সমাজের ভবিষ্যতের দর্শন। মার্কসবাদ হলো বাস্তববাদ এবং ইহাতে প্রত্যেকটি ঘটনা যুক্তি দ্বারা বিচার করা হয় এবং সমস্ত রকম অন্ধবিশ্বাস বর্জ্জন করা হয়। আমরা যদি প্রকৃত মার্কসবাদী হই তাহ'লে মার্কস যা লিখে গেছেন তাও অক্ষরে অক্ষরে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে বিচার করে দেখবার সাহস থাকা আমাদের প্রয়োজন। যতদিন না মার্কসবাদের এই প্রকৃত ঐতিহ্য আমরা গ্রহন করতে পারবো ততদিন মার্কসবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি বুলি আওড়ে আমরা উপকার না করে আরো অপকারই করবো।

মার্কসীয় নীতি হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ ও ফয়েরবাকের বিজ্ঞান-সম্মত মনুষ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুগ যুগান্তরের ধর্ম্মাত্মক, ঐশ্বরিক ও পরমার্থিক রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে, ফয়েরবাক্ মানুষকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে স্থান দেন, এবং মানুষের মাপ কাঠিতেই সবকিছুর, এমনকি সামাজিক ও ধর্ম্মাত্মক রীতিনীতির, বিচার ও বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু ফয়েরবাক মানুষকে অবাস্তব রূপে গণ্য করেন ; মার্কস ও এঙ্গেলস ফয়েরবাকের সেই ধারণাকে বাতিল করে মানুষকে চিরপরিবর্ত্তনশীল সামাজিক জীব হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দ্বন্দ্ববাদীয় বিচারের ফলে ফয়েরবাকের মনুষ্যবাদ মার্কসবাদে পরিণত হয়, রূঢ় সমালোচনার দ্বারা ফয়েরবাকের তত্ত্ব নূতন ভাবে প্রতীয়মান হয় এবং পরমার্থিক তথ্যের প্রকৃত মনুষ্য ভাব প্রকাশিত হয়। জীবতত্ত্বের আবিষ্কারের দ্বারা ঈশ্বরবাদের রহস্য ও ধর্ম্মের মূল উদ্‌ঘাটিত হয়, এবং আত্মার অভিব্যক্তিই যে বিশ্বাস তাও প্রকাশ পায়। কিন্তু ফয়েরবাকের দর্শনের প্রধান দুর্ব্বলতা ছিল তার মূল ভিত্তিতেই। ফয়েরবাকের মতে, মানুষের স্বত্তাই তার বিবেক বুদ্ধি পরিচালনা করে এবং এই স্বত্তা তার নিজস্ব নিয়মাধীন ; কিন্তু কি এই নিয়ম বা কি ভাবে তারা চালিত হয়, এ সম্বন্ধে ফয়েরবাক কোন উত্তর দেন নি। মানুষকে দিয়েই সব কিছুর ব্যাখ্যা করা হলো কিন্তু মানুষ নিজেই রইলো অজানা, অপরিবর্ত্তনীয়, চিরস্থির।

মার্কস বলেন যে মানুষের বিবেক তার ব্যবহারিক জীবনের

উপর নির্ভর করে ; কিন্তু এই ব্যবহারিক জীবন আবার সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হয় ; এবং মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং তার চিন্তাধারার বিকাশও এই পরিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। "মানুষ অবিনশ্বর, অপরিবর্ত্তনীয়" এই ধারনা থেকেই সম্ভবতঃ আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছাই যে, মানুষের চিন্তাধারা সব অবস্থাতেই এবং সব কালেই এক। চিরন্তন সত্য এবং অবিনশ্বর নৈতিক আদর্শ এই অপরিবর্ত্তনীয় ধারনার উপসংহার। মানুষের সত্বা ও বিবেক সম্বন্ধে যত কিছু দ্বৈত ভাব তা, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের এই মতামত দ্বারা দূর হয় যে, "নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে পরিবর্ত্তন করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের প্রকৃতিকেও পরিবর্ত্তন করে" (মার্ক্স্)।

জীবনের সংগ্রাম মানুষ ব্যক্তিগতভাবে করে না, সমষ্টিগত ভাবে করে। ইতিহাসের সুরু থেকেই মানুষ সামাজিক জীব। তাই মানুষের স্বত্বা ও তার চিন্তাধারা সামাজিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। ইতিহাসের ব্যাপক ও বিস্তৃত চর্চ্চা এবং অনুসন্ধানের ফলে মার্কস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন যে, মানুষের বিবেক তার জীবন ধারণের প্রণালীর উপর নির্ভর করে ; কারণ তার অর্থোপার্জ্জনের এবং জীবন যাত্রার ধারার উপরই, মানুষের চিন্তা-ধারা ও তার প্রকাশ নির্ভর করে। ধর্ম্ম, দর্শন, কারুবিদ্যা, আইন কানুন—সবই সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আদর্শের বিভিন্ন রূপ।

মানুষ যখনই উপলব্ধি করে যে, সামাজিক জীব হিসাবে সে

নিজেই তার ভাগ্য বিধাতা তখনই সে ভূয়ো পরমার্থিক নৈতিক আদর্শের বাদবিচার ও অত্যাচার থেকে নিজেকে মুক্ত করে। চিরন্তন সত্য বা ভাল মন্দর অবাস্তব ধারণা জীবণের আদর্শ নয়। জীবনের আদর্শ—পরিবর্ত্তন, অগ্রগতি এবং উন্নততর অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হওয়া। এই নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি মানুষ তার স্বীয় অর্জ্জিত সামাজিক জ্ঞানের সাহায্যে সম্পন্ন করে। মানুষের আদর্শ ও ধারনা চিরপরিবর্ত্তনশীল। মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সেই পরিবর্ত্তনের প্রতিকৃতি। পুরাকালে সামাজিক পরিবর্ত্তন কোন নিয়মাধীন ছিলনা, তাই এই ধারণা হয়েছিল যে, মানুষের জীবন এক অলৌকিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত। বিজ্ঞানের সাহায্যে আজ মানুষ তার নিজের ভবিষ্যত নির্ধারণ করবার ক্ষমতা অর্জ্জন করেছে, আজ সামাজিক পরিবর্ত্তন পূর্ব্বকল্পিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবর্ত্তন করা সম্ভব। মানুষের নৈতিক আদর্শকে এভাবে গঠন করতে হবে যাতে মানুষের ভবিষ্যত সামাজিক সংগঠনে তা সাহায্য করে। একমাত্র সমষ্টিগত সামাজিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ও মাপকাঠিতে, সকলের পক্ষেই যা মঙ্গল জনক—তাই ধার্য্য এবং গ্রাহ্য হবে। সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধারণারও পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত।

চিরন্তন অপরিবর্ত্তনীয় আদর্শ হিসাবে নীতি প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার সমর্থনের দার্শনিক ভিত্তি। সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য যে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন প্রয়োজন এবং এই পরিবর্ত্তনকে সাহায্য করার জন্য নৈতিক আদর্শের যে বাস্তব ও পরিবর্ত্তনশীল ধারনার

প্রয়োজন --তা সমর্থন না করে এবং সমাজের পরিবর্ত্তে মাত্র কয়েক-জনের স্বার্থ রক্ষায় প্রবৃত্ত হয়ে, নীতি তার স্বীয় আদর্শকেই ব্যর্থ করছে।

ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির ধারণার উপরই চিরারচিত নীতি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই সব আদর্শের কখন কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নির্ধারণ করা হয়নি বা কোন ব্যাখ্যা করা হয়নি। সামান্য আলোচনা বা বিচার করলেই ইহাদের বৈপরীত্য এবং অযৌক্তিকতা প্রকাশ পায়। প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে মঙ্গলজনক এবং তার সমর্থক না হলেই, তাকে কুখ্যাখ্যা দেওয়া হয়। সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলার্থে যখন কোন সামাজিক পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় হয়, তখন জাগৃতিশক্তি প্রচলিত 'স্ব'কে অগ্রাহ্য করে, চিরাচরিত শ্রদ্ধেয় আদর্শকে ধ্বংস করে। তাই বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠিত সমাজে যা মন্দ, ভবিষ্যতের পক্ষে তাই ভাল। প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের জন্য, জীবনের মৌলিক আদর্শের ভিত্তিতে ইহা সাধিত হয়।

মানুষ স্বভাবতই অশ্রান্ত। তা' না হলে আজও মানুষ বর্ব্বর অসভ্যদের মত বাস করতে কুণ্ঠিত হতো না। মানুষ স্বভাবত শ্রান্ত. ইহা বলা অপেক্ষা, হেগেলের মতানুযায়ী ইহা বলাই ঠিক হবে যে মানুষ স্বভাবতই অশ্রান্ত। মানুষ যখনই সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়েছে, তখনই সে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা এবং নৈতিক আদর্শকে লঙ্ঘন করছে। সাধারণ ভারতবাসীর আধু-নিক সভ্যতার প্রতি বিদ্রূপ, এ বিষয়ে উদাহরণ স্বরূপ।

প্রতিষ্ঠিত, অনুন্নত সমাজের পক্ষে আধুনিক সভ্যতার আদর্শ ও চিন্তাধারা কখনও সহযোগী হতে পারেনা। হিন্দু সমাজের কাছে তাই আধুনিক সমাজ ঘৃণ্য। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হলে যারা উপকৃত হবে, তাদের কাছে আধুনিক সভ্যতা ভাল এবং কাম্য।

মানুষের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য অসহযোগীতা। দোষ, গুন সম্বন্ধে মানুষের যে অপরিবর্ত্তনীয় ধারণা আছে—তা বর্জ্জন করার সঙ্গে সঙ্গে নীতি সম্বন্ধেও মানুষের ধারনায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আসে; এবং এই নূতন বৈপ্লবিক ধারণা মানুষের মনে অবিশ্রাম সংগ্রামের প্রেরনা জাগায়। বৈপ্লবিক দর্শন হিসাবে মার্কসবাদ সেই পরিবর্ত্তনকে সাহায্য করে, প্রেরনাকে জাগিয়ে তোলে। সভ্যতা, উন্নতি এবং মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য এই পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদে ভবিষ্যৎকে গোড়ে তোলবার শক্তি, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা থেকেই মানুষ পায়। তাই অপরিবর্ত্তনীয়, চিরস্থির নৈতিক আদর্শের বর্জ্জন মার্কসবাদের প্রধান লক্ষ্য। শুধু তাই নয়, এই নৈতিক আদর্শের মেরুদণ্ড যে সব ধর্ম্মাত্মক ও ভুয়ো পরমার্থিক মতবাদ প্রচলিত আছে, বিজ্ঞানের সাহায্যে মার্কসবাদ তাদের একেবারে বিনষ্ট করে দেয়।

পাশ্চাত্যের নৈতিক আদর্শ প্রাচীন প্রকৃতিবাদ ধর্ম্মের ভিত্তিতে গোড়ে ওঠে। আধুনিক নীতিশাস্ত্রও কোন বিশেষ ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। পাশ্চাত্য নৈতিক আদর্শের প্রবর্ত্তক

সক্রেটিস প্রকৃতিবাদ ধর্ম্মের ঐশ্বরিক কল্পনায় বিশ্বাস না করার জন্য খুন হয়েছিলেন। মধ্যযুগের শেষ ভাগে মনুষ্যবাদ এবং যুক্তিপূর্ণ পরমার্থবাদ ধর্ম্মের গোঁড়ামী এবং ঐশ্বরিক মোহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। পুরাকালের এবং আধুনিক নীতি শাস্ত্রের অপরিবর্ত্তনীয় এবং একনিষ্ট আদর্শ মূলতঃ অন্ধবিশ্বাস। এই বিশ্বাস মানুষের স্বভাবজাত এবং তাকেই মানুষের শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ হিসাবে মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু দার্শনিক চিন্তাধারা হিসাবে ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর। সুতরাং পরোক্ষভাবে না হলেও অন্তরীক্ষভাবে এই চিন্তাধারার অনুমোদন অবাস্তব এবং পরমার্থিক জগতের কল্পনার উপর নির্ভর করে।

সক্রেটিস নিজে নীতিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করেননি। প্রকৃতপক্ষে সক্রেটিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর প্রধান শিষ্য প্লেটো নীতিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন। এই বিশ্লেষণ সক্রেটিসের যুক্তিশাস্ত্রের উপদেশ অনুযায়ী পরমার্থিক নৈতিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। সক্রেটিসের বিধর্ম্মী নীতির পরমার্থিক ভিত্তিই ছিল খৃষ্টীয় ঈশ্বরবাদের দার্শনিক ভিত্তি।

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে ধর্ম্মের বাহিরে কোন নৈতিক দর্শন বা আদর্শ গোড়ে ওঠেনি। স্মৃতি ও সংহিতাগুলি কতকটা কাছাকাছি যায়; কিন্তু এই সব শাস্ত্রে যে সব সামাজিক ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের নিয়মাদির কথা উল্লেখ আছে, সেগুলি সবই পুরোহিত ধর্ম্মের অনুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যাক্তিগত, মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির নৈতিক অবলম্বন হিসাবে তার কোন

উপকারিতা নেই। কারণ প্রথমত, ধর্ম্মের নিয়ম কানুনের মধ্যে দিয়ে তার কোন সম্ভবনা নেই এবং দ্বিতীয়তঃ এই সব নিয়মাদি মানুষের পার্থিব জীবন যাপনের ধর্ম্মানুশাসন মাত্র।

মূলতঃ ভূমার অনুভূতির উপরই চিরাচরিত নৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠিত; তারই উপর এই দর্শনের ন্যায়-অন্যায়, দোষ-গুন, ভাল-মন্দ এই সবের ধারনা নির্ভর করে। এই সব আদর্শই মানুষের ব্যবহারিক জীবনের একমাত্র পাথেয়। যে কোন নীতিবিদকেই কি ভাল, কি মন্দ জিজ্ঞাসা করলেই সে এই উত্তর দেবে যে ঈশ্বরই ভাল মন্দের প্রতীক। ভাল বলতে কি বুঝি, সে বিষয় জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দেবে যে, ভাল মন্দর কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই, ইহা স্বভাবজাত এবং মানসিক উপলব্ধির উপর নির্ভর করে। বস্তুত ভাল মন্দের ধারনা আসলে অবাস্তব, অবিনশ্বর। আধুনিক নীতিশাস্ত্র প্লেটোর আদর্শ থেকে কিছুই উন্নত হয়নি। অবাস্তবতা থেকেই নৈতিক দর্শনের ভুয়ো আদর্শের সৃষ্টি। সাধারনত ধরে নেওয়া হয় যে মানুষ তার স্বাভাবিক অনুভূতির উপরই তার নৈতিক আদর্শ গোড়ে তোলে। যদি তাই সত্য হয় তাহলে মানুষের প্রত্যেকটি কাজই নীতিসঙ্গত বলে ধরে নেওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নীতিশাস্ত্র কতকগুলি নিয়ম কানুন বেঁধে দেয়, যা মানুষকে মেনে চলতে হয়। আদর্শ এবং বাস্তবের এই প্রভেদের কারণ পরিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে মানুষের বিবেক বুদ্ধি নৈতিক আদর্শের প্রতি তার ন্যায় সঙ্গত স্বাভাবিক ঈপ্সাকে অচ্ছন্ন করে রাখে। তাই যদিও ভাল মন্দের বিচার মানুষের

স্বভাবজাত, তবুও ভাল মন্দের বিচার করে মানুষ তখনই চলতে পারে যখন সে তার নিজের পরিপার্শ্বিক অবস্থাকে অগ্রাহ্য করে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে। তাই শেষ পর্য্যন্ত একমাত্র সাধু সন্ন্যাসীদের দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়, কারন একমাত্র নির্লিপ্ত পবিত্র মনের দ্বারাই এই ভাবে ভাল মন্দের বিচার করা সম্ভব।

ক্যাণ্ট যুক্তিবাদের আদর্শের নীতিকে গোড়ে তোলবার বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর আনুমানিক স্থির সিদ্ধান্তের সঙ্গে প্লেটোর মতের মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই। 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম' এর চিরন্তন আদর্শের উপর প্লেটোর দর্শন প্রতিষ্ঠিত, এর মধ্যে সত্যম্ এবং সুন্দরম্ পার্থিব জগতের স্থান-কাল-পাত্র জনিত সীমার অতীত ভূমা বিশেষ। কিন্তু নৈতিক স্বাধীনতা ও ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা এই জগতেরই ব্যাপার— অসীমের নয়। সেই জন্যই পার্থিব সংজ্ঞার প্রয়োজন এবং কান্টিয় মতানুবর্ত্তী দার্শনিকেরা তা' উপলব্ধি করেছিলেন। উদাহরন স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, জ্যাকবীর (Jacobi) মতে নীতির শেষ অনুমোদন অতিমানবীয় তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তিবাদী পরমার্থিক নৈতিক দর্শনের সার এই যে, বিশ্বাসই সবের মূল এবং ইহাই দর্শনের শেষ জ্ঞান। এই মতবাদই ক্যান্টিয় দর্শনের উপসংহার। ফলে, কতকগুলি অবাস্তব আদর্শে বিশ্বাসই নীতির মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, 'পরমার্থিক নৈতিক আদর্শ' ঐশ্বরিক আদর্শেরই রূপান্তর হয়ে ওঠে।

কিন্তু যখনই চিরন্তন সত্যের এই বিরাট মিথ্যা প্রকাশ পায়

তখনই নৈতিক দর্শনের সমস্ত ভিত্তি চূর্ণ হয়ে যায়। এই বৈপ্ল-বিক জ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব; এবং আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিক মতবাদ হলো মার্কসবাদ।

নৈতিক আদর্শ চিরন্তন স্থির সত্য নয়, ইহা আপেক্ষিক সংজ্ঞা মাত্র। একের পক্ষে যা ভাল অপরের পক্ষে তা ভাল নাও হতে পারে, হয়তো অপরের পক্ষে তা, অত্যন্ত মন্দ। সময়ের সাথে সাথেও আবার এই ভাল মন্দর ন্যায্যতা পরিবর্ত্তিত হয়। আজ যা ভাল কাল হয়তো তা ভাল নাও থাকতে পারে। সমস্ত নৈতিক আদর্শই এই রকম আপেক্ষিক সংজ্ঞা মাত্র। বস্তুর অপেক্ষা অবাস্তব গুণের আদর আরও বেশী ভ্রমাত্মক। এই আদর্শের সঙ্গে পার্থিব জগতের কোন সংশ্রব নেই। এই সব পরমার্থিক ও ধর্ম্মাত্মক ভিত্তিকে শিথিল করে দিয়ে বিজ্ঞান নৈতিক আদর্শে এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে।

এই সব পরমার্থিক বাদ বিচারের অত্যাচার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মনুষ্যবাদ প্রথমে এক ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। ধর্ম্ম এবং নীতির এই অত্যাচারের অবসান করতে হলে ভুয়ো ঈশ্বরবাদকে বিনষ্ট করে, তার পরিবর্ত্তে মানুষের আচার ব্যবহারের আদর্শ হিসাবে বাস্তবিক, মূলগত ও প্রমাণযুক্ত সত্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মনুষ্যবাদ দ্বারা ইহা সম্ভব নয়। মনুষ্যবাদ ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে কিন্তু তার পরিবর্ত্তে অতিমানুষকে প্রকৃতি অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে প্রতিষ্ঠা করে।

ইতিহাসের প্রত্যেকটি মূহুর্ত্তে এবং ব্যক্তিগত জীবনের

প্রত্যেকটি রূপে, মানুষের জীবন ও আদর্শ নির্ভর করে তার সাময়িক, ঐতিহাসিক, সামাজিক পরিবেশ এবং বিশেষ বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। কিন্তু ঈশ্বরবাদের বাস্তবতা দূর করে তার পরিবর্ত্তে অতিমানুষের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করলে অবস্থার কোন প্রভেদ হয়না। "আত্মার অমরতা ঐশ্বরিক ক্ষমতা বা পরমার্থিক নৈতিক আদর্শ অপেক্ষা মানুষের প্রকৃতির চিরন্তন, অপরিবর্ত্তনীয় এবং স্বভাবজাত সদ্ভাবের আদর্শ অধিকতর প্রত্যক্ষ সত্য নয়।"

যখনই মানুষ অনুভব করে যে সে এই পার্থিব জগতেরই এক অংশ তখনই সে অবাস্তবতার ধোঁয়া এবং ঈশ্বরবাদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হতে পারে। দর্শন হিসাবে কার্য্যকরী হতে হলে মনুষ্যবাদকে প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক হতে হবে, নৈতিক হলে হবে না। মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাব ধারা এবং অভিব্যক্তি পার্থিব জগতেরই অংশ বিশেষ, সুতরাং মানুষের স্বভাবও প্রকৃতির অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল। ভ্রমাত্মক ধারনা মানুষের ভাল মন্দ বিচারের শ্রেষ্ঠ আধার হতে পারেনা। সামাজিক বিবর্ত্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকলেই বোঝা যায় যে, মানুষের প্রকৃতি অপরিবর্ত্তনীয় নয়।

পার্থিব এবং সামাজিক পরিবেশের উপর, এবং স্থান ও কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানুষের নৈতিক আদর্শও পরিবর্ত্তিত হয়। মানুষ সামাজিক জীব; তাই সমাজের সমষ্ঠির রক্ষণাবেক্ষনের জন্য সে যা করে এবং যা তাকে করতে হয়, তার উপরই

তার স্বভাব ও প্রকৃতি নির্ভর করে। মনুষ্যসমাজ চিরস্থির নয়; ইহা পরিবর্ত্তনশীল। সমাজের অস্তিত্বের উপায় ও নির্ব্বন্ধ এবং সমষ্টিগত মঙ্গলের আধার, মানুষের নৈতিক আদর্শকেও পরিবর্ত্তিত করে। সমাজের বাহিরে মানুষের ব্যক্তিগত কোন সত্তা নেই। সমষ্টিগত ভাবেই সে তার সত্তা অনুভব করে, যদিও সমাজ ব্যক্তিগত মানুষের কোন চিহ্নই বহন করেনা। সামাজিক পরিবেশের উপরই ব্যক্তিগত সত্তা নির্ভর করে। ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বিবর্ত্তনের প্রতিচ্ছবি হচ্ছে মানুষ। নৈতিক দর্শন ও আদর্শ আসলে সামাজিক দর্শন ও আদর্শ। সামাজিক প্রয়োজনিয়তার উপরই নৈতিক বাদবিচার প্রতিষ্ঠিত এবং সমষ্ঠিগত মঙ্গলের উপরই সেই নৈতিক আদর্শের বিচার হবে।

নৈতিক দর্শন যখন কোন প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার রক্ষার জন্য সমষ্টির মঙ্গলের বিরুদ্ধে কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ সমর্থন করতে প্রবৃত্ত হয়, তখন নৈতিক দর্শন অবাস্তব গুণের ভ্রান্ত পরমার্থিক আদর্শের আশ্রয় নেয়। অন্যায় সমাজ ব্যবস্থার সমর্থন এই কাল্পনিক, ঐশ্বরিক নৈতিক আদর্শ দ্বারাই সম্ভব হয়। এই অবিনশ্বর অপরিবর্ত্তনীয় নৈতিক আদর্শই ঈশ্বরবাদের ভিত্তি। আজ যে পৃথিবী এই অবস্থায় উন্নীত হয়েছে তার কারণ বিবর্ত্তনের চাপে ইহার অন্যথা হওয়ার উপায় ছিলনা। মার্কসবাদ নৈতিকদর্শনকে এই সব ভূয়ো অবাস্তবতার থেকে উদ্ধার করেছে।

বিজ্ঞান, দর্শন ও রাজনীতি

সাধারণত একটা ধারনা আছে যে, বিজ্ঞান ল্যাবরেটারীতে চর্চ্চা করা হয় এবং দর্শন হিমালয়ের উচ্চচূড়ায় বসে চিন্তা করা হয়, সুতরাং রাজনীতির মত নিম্নস্তরের বিষয়ের সহিত তাদের কি সম্বন্ধ ? তাই প্রথমত দর্শন ও বিজ্ঞানের সঙ্গে রাজনীতির কি সম্বন্ধ তা' আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রচলিত ধারণা এই যে, যাদের কোন কাজ নেই এবং জীবনের কোন দিকেই কোন কিছু করতে পারেনি, সেই সব অকর্ম্মণ্য, বেকার লোকদের কাজই হচ্ছে রাজনীতি করা এবং তাই এটা অত্যন্ত নোংরা কাজ। কাজে কাজেই সকলেরই ধারনা রাজনৈতিক ব্যাপারে যত কিছু খারাপ কাজই হয়ে থাকে, এবং এ ধারনা শুধু আমাদের দেশেই যে বিদ্যমান তা' নয় অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও ইহা অনেকাংশে সত্য। তার একটা কারণ এই যে, রাজনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। দূর্ভাগ্যবশত বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থা এতই মন্দ যে, তা নিয়ে কারবার কখনই পবিত্র, উন্নত বা আদর্শস্থানীয় হতে পারে না। সুতরাং রাজনীতি সম্বন্ধে স্বভাবতই লোকের ধারনা খুব বিকৃত রাজনৈতিক কর্ম্মীদের মধ্যেও অনেকের ধারণা নেই যে, রাজনীতি একটা বিজ্ঞান। যদিও ইহা একটা স্বাধীন বিজ্ঞান নয় তাহলেও রাজনীতি সমাজ বিজ্ঞান। অন্যান্য বিজ্ঞানের সাধারণত স্থির সংজ্ঞা আছে

কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের কারবার হলো মানুষ নিয়ে যা সৃষ্টিজগতের মধ্যে সবচেয়ে অস্থির এবং পরিবর্ত্তনশীল। অধুনা বিজ্ঞানের একটা মৌলিক সিদ্ধান্ত এই যে, অঙ্কের ভাষায় না প্রকাশ করতে পারলে কোনো মতবাদকেই বিজ্ঞানের মর্য্যাদা দেওয়া যাবে না। যদিও অঙ্কশাস্ত্র অজানা জিনিষ নিয়ে গবেষণা করে তবুও কয়েকটি পরিচিত সংজ্ঞা ছাড়া গণিতশাস্ত্রের কোন সিদ্ধান্তই সম্ভব নয়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান আজ পর্য্যন্ত সামাজিক জীবনে মানুষের আচারব্যবহারের কোন পরিচিত সংজ্ঞা ঠিক করতে পারেনি। সামাজিক সমস্যা অঙ্কের আকারে প্রকাশ করা যায় না, তাই রাজনীতিকেও বিজ্ঞান বলা যেতে পারে না।

প্রচলিত ধারনা হলেও ইহাই একমাত্র সত্য নয়। অনেকের মতে সমাজেরও বিজ্ঞান সম্ভব; মানুষের আচার ব্যবহারের কিছু কিছু নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায়, যা থেকে সামাজিক সমস্যা, মানুষের সামাজিক জীবনের ব্যবহার ইত্যাদির সমস্যা প্রায় অঙ্কের মতই বিচার করা যাবে। মানুষের সামাজিক জীবনের আচার ব্যবহারের নিয়মাদি যে বিজ্ঞান ধার্য্য করে তাই হচ্ছে রাজনীতি। কিছু নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা বা মানুষের ব্যবহারের কোন মাপকাঠি না থাকলে সামাজিক জীবনের কোন সূত্র রচনা করাই সম্ভব নয়। যতদিন রাজনীতিকে বিজ্ঞান থেকে পৃথক ভাবে দেখা হবে,ততদিন রাজনীতির মধ্যে যৌক্তিকতা থাকবে না বা তার কোন মূল সিদ্ধান্ত বা সংজ্ঞাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু রাজনীতি আর বিজ্ঞানের মধ্যে সেই পার্থক্য

আজ আর নেই। এখন আর মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে আপ্রাকৃতিক ভাবে বিজ্ঞানের চর্চ্চা সম্ভব নয়, তাছাড়া এখন দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রদর্শনের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। তবে এখনও এমন অনেকে আছেন যাঁরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে মেনে নেন না।

সাধারণত এই ধারনা প্রচলিত আছে যে, দর্শন ও বিজ্ঞান দুইটি বিভিন্ন শাস্ত্র এবং ইহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই। বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হলো জড় জগত আর দর্শনের বিষয়বস্তু পরমার্থিক জগত,—সুতরাং এদের মধ্যে কোন যোগাযোগ বা সম্বন্ধ থাকা শক্ত; যদি এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে কোন সম্বন্ধ না থাকে—তাহলে আমরা একথা বলতে পারি না যে, রাষ্ট্র বিজ্ঞান রাষ্ট্রদর্শন দ্বারাই ধার্য্য হয়।

আবার অনেকের মতে রাষ্ট্রীয়সমাজে মানুষের আচারব্যবহারের মোটামুটি ভাবে কয়েকটি সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা যায় কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা' কোন কাজে লাগে না; যেমন গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের মতো আজ আর কোন আদর্শই এত হেয় নয়। প্রায় একশো বৎসর ধরে গণতন্ত্রই ছিল রাষ্ট্রদর্শনের মৌলিক আদর্শ; আর আজ তা সর্ব্বত্রই অশ্রদ্ধেয়। এই থেকে মানুষের ধারনা জন্মেছে যে, গণতন্ত্র মাত্রই কাল্পনিক আদর্শ; কোনদিনই তা বাস্তবে পরিনত হতে পারে না। অবশ্য ইহা খুবই যুক্তিসঙ্গত যে সামাজিক জীবনের নিয়ম-কানুন রচনায় প্রত্যেকের অধিকার থাকা উচিত কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সেই অধিকার অলৌকিক কল্পনাই

থেকে যায়। বস্তুত দেখা যায় যে, সমষ্টিগত জীবনে মানুষ মেষের মত ব্যবহার করে এবং গড্ডালিকার মতই একাধিপত্য শাসনের বশীভূত।

মানুষের সামাজিক জীবন থেকে এই যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে-তাতে করে মনে হয় যে, রাষ্ট্রদর্শনের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নেই। আদর্শ সমাজের কতকগুলি সুন্দর সুন্দর নিয়ম কানুন রচনা করা যায় কিন্তু তা সবই অবাস্তব, অপ্রাকৃতিক—বর্ত্তমান সমাজে তার প্রয়োগের কোন উপায় নেই। মানুষের স্বভাব অপরিবর্ত্তনীয়, অবিনশ্বর, এবং সেইজন্যই মানুষের সমাজও এই ভাবে চিরকাল থাকবে কোন পরিবর্ত্তন হবে না—ইহাই সাধারণ মত। কাজে কাজেই সেই সব সিদ্ধান্তগুলি কখনও বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়না এবং ধরে নেওয়া হয় যে, রাষ্ট্রদর্শনের ভিত্তিতে সামাজিক জীবন গড়ে তোলা বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্ভবপর নয়।

এই ধারনা দূর করবার জন্য আমাদের বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্বন্ধ কি এই মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং জানতে হবে যে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে অবাস্তব জীবনের আদর্শের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রগতির ইতিহাস এখনকার প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই সুবিদিত। এটা প্রায় সকলেই বিশ্বাস করে যে বিজ্ঞানের উন্নতির দ্বারা এমন পরিস্থিতির সূচনা হবে যাতে করে সাধারণের জীবনধারণের সুখ সুবিধা অনেক বেড়ে যাবে; কিন্তু জীবনের যে অন্যান্য সমস্যা

(সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য ইত্যাদি) যা থেকে দর্শনের উদ্ভব হয়েছে তা, বিজ্ঞান সমাধান করতে পারেনা। সুতরাং বিজ্ঞান সৃষ্টির মূল সমস্যা গুলিকে মাত্র ওপর ওপর স্পর্শ করে, তার সমাধান করতে অক্ষম।

তাই প্রথমেই আমাদের এই ভ্রান্তিটি দূর করবার জন্য দেখাতে হবে যে, যেমন সিদ্ধান্ত ও কার্য্যসূচীর মধ্যে মৌলিক কোন প্রভেদ নেই তেমনি বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যেও কোন প্রভেদ নেই। দর্শন যদি অপ্রাকৃতিক স্তর থেকে বাস্তবে নেমে এসে জীবনের সমস্যার সম্মুখীন না হয় তাহলে মানুষের দর্শনের কোন প্রয়োজন নেই। যদি ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও কার্য্যকলাপের সমস্যাগুলির সঙ্গে দর্শনের কোন যুক্তিযুক্ত সম্বন্ধ না থাকে তাহলে মানুষের কাছে দর্শন শুধু ভুয়ো কল্পনা এবং তা মানুষের কোন কাজে আসেনা।

সাধারনত একটা ভুল ধারনা আছে যে, বিজ্ঞান তো সে-দিনের জিনিষ। কিন্তু আসলে বিজ্ঞান সৃষ্টির গোড়া থেকেই আছে; এবং ইহা দর্শন অপেক্ষা প্রাচীনও নয় বা নূতনও নয়। দর্শনের সুরুই বিজ্ঞানের সুরু। বরঞ্চ দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকলে ইহাই দেখা যায় যে, বিজ্ঞান দর্শন অপেক্ষাও প্রাচীন। অন্তত বিজ্ঞানের যে প্রচেষ্টা, পদার্থিক ঘটনাবলীর কারন জানবার জন্য যে উৎসুক্য (যার থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি) সেই উৎসুক্য দর্শনের চেয়েও আদিম। এই উৎসুক্য থেকেই দর্শনের সৃষ্টি নয় কি?

মানুষ শুধু জড়জগত নিয়েই ব্যাপৃত থাকে না, সাধারনত ইহাই ধরে নেওয়া হয় যে, অপ্রাকৃতিক নৈস্বর্গিক প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করাই মনুষ্য-জন্মের মূখ্য উদ্দেশ্য। প্রাচীন ইতিহাস পুরাতন পুঁথি ও ঘটনাবলীর থেকে এবং এখনও যে সব অসভ্য, অনুন্নত সমাজ আছে তার সঙ্গে আধুনিক কালের সভ্য ও উন্নত সমাজের তুলনা করলে আমরা একটা জিনিষ দেখতে পাই যে, আদিম মানুষের মনে তার অস্তিত্বের বাইরে যে কোন অলৌকিক শক্তি আছে এই ধারনা কোনদিন আসেনি। ঈশ্বর এবং আত্মার ধারনা আদিম মানুষের চিন্তাশক্তি এবং কল্পনার বাইরে। তাই সে আদিম মানুষ। এই আদিম মানুষই আমাদের পূর্ব্বপুরুষ। যদি ঐশ্বরিক শক্তির উপলব্ধির ইচ্ছাই মনুষ্য জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য হয় এবং এই ইচ্ছা যদি আমাদের মধ্যে অমর আত্মা হিসাবে বিরাজ করে তাহলে তার প্রকাশ আদিম মানুষের মধ্যেও পাওয়া যাবে। তা যখন যায় না, তখন ধরে নিতে হবে যে ঈশ্বরজিজ্ঞাসার উৎসুক্য বা প্রচেষ্টা সামাজিক বিবর্ত্তনের কোন এক সন্ধিক্ষনে মানুষের মনে প্রবেশ করে।

সেক্ষেত্রে আমরা কি করে প্রমান করতে পারি যে, আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও দর্শনের আদি এবং মূল সমস্যা—কেন এবং কি করে এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি হয়েছে? ভারতবর্ষ, মিশর, গ্রীস এবং চীন দেশে, অর্থাৎ যে সমস্ত দেশ শিক্ষা ও জ্ঞানে অন্যান্য সব দেশ অপেক্ষা অগ্রদূত এবং উন্নত ছিল

সে সব দেশের প্রাচীন ইতিহাস থেকেও আমরা এই পাই যে, সেখানকার বুদ্ধিজীবিরাও এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। তারাও এই জীবনের পরে কি আছে সে সম্বন্ধে চিন্তা করতো। এসব থেকে এই ধরে নেওয়া হয় যে, মানুষ প্রথম থেকেই অলৌকিক, পরমার্থিক এবং অপ্রাকৃতিক ব্যাপারে অনিষ্কিৎসু। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, ভারতীয় সমাজ যেমন কনদ ও কপিল থেকে সুরু নয়, গ্রীক সমাজও তেমনি থেলস, ডেমোক্রাই-টস বা প্লেটো, সক্রেটিসকে নিয়েই সুরু হয়নি। ভারতীয় সমাজে যেমন আদিম অধিবাসীরা ঋগ্‌বেদের ঋষির চেয়ে প্রাচীন—গ্রীসেও সেই রকম ওইসব মহা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আগেও মনুষ্যসমাজ ছিল। তাদের চিন্তা ধারা এবং তাদের আধ্যাত্মিক প্রতিভা সম্বন্ধে গবেষনা করলে আমরা দেখতে পাই দর্শনের মূল সমস্যা বলে যে সব জিনিষ অধুনা প্রচলিত তা' সৃষ্টির সুরু থেকেই ছিল না।

দূর্ভাগ্যবশত, লিখিত পুঁথিপত্র শেষ পর্য্যন্ত না থাকায়, আমরা সামাজিক বিবর্ত্তনের ইতিহাসের গোড়ার ব্যাপার জানতে পারিনা। বৈদিক যুগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা কি ভাবে বাস করতো, কি চিন্তা করতো এবং কিই বা তাদের আচার ব্যবহার ছিল সে সম্বন্ধে কোন লিখিত ইতিহাস নেই। সেই রকম অন্যান্য দেশেরও এই এক অবস্থা। সুতরাং আদিম মানুষের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে গবেষনা করতে হলে তার দুটি উপায়: প্রথমত আমরা ইতিহাস থেকেই পাই যে, দর্শনের প্রবর্ত্তকেরা

অপ্রাকৃতিক ব্যাপার সম্বন্ধেই চিন্তিত ছিল। কতকগুলি পদার্থিক ঘটনাই মানুষের চিন্তাশক্তিকে সজাগ করে তোলে; সেই সব পদার্থিক ব্যাপারের কারণ জানবার জন্য মানুষ উৎসুক হয়ে ওঠে এবং এই উৎসুক্য থেকেই দর্শনের মৌলিক সমস্যার উদ্ভব হয়।

আজকের সভ্য জগতে বাস করে আমরা ভাবতেই পারিনা যে, মানুষের জীবনের সঙ্গে রৌদ্র, বৃষ্টি, বন্যা, ঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনার কি নিগূঢ় সম্বন্ধ। কিন্তু বর্ত্তমান যুগেও যদি আমরা সহরের বাইরে বনে জঙ্গলে বা পাহাড়-পর্ব্বতে যাই তাহলে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের কি নিবিড় সম্বন্ধ তা' বুঝতে পারবো। সেখানে প্রাকৃতিক ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা পাবার কিছুই নেই। আগুনের দরকার হলে হয়তো দিয়াশলাই নাও থাকতে পারে তখন পাথরে পাথরে ঘসে আমাদের আগুন জ্বালাতে হবে; এবং এই রকম আরো সব প্রাকৃতিক ঘটনার ভীষণ রূপের সম্মুখীন হতে হবে। আজ আমাদের আগুণের দরকার হলে আমরা দিয়াশলাই, গ্যাস বা ইলেকট্রিক থেকে পেতে পারি। আজ আমাদের বনভোজনে গিয়ে পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালাতে আমোদ লাগে, কিন্তু আদিম মানুষের কাছে এটা মজার ব্যাপার ছিল না, এটা তাদের কাছে জীবন-মৃত্যুর মত ব্যাপার। আদিম মানুষ পাথরে পাথরে ঠুকে আগুন জালতে বই পড়ে শেখেনি। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাকে এটা বার করতে হয়েছিল। যখনই দরকার তখনই আগুন জ্বালাবার

সমস্যা তাকে আগুনের স্থায়ী উপায় বার করতে প্রবৃত্ত করে। এই থেকে আগুনের কারণ সম্বন্ধে নানান অনুমানের সুরু হয় এবং এই রকম প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ব্যপারই আদিম মানুষের অনিসন্ধিৎসু ঐশ্বরিক কল্পনায় শেষ হয় আর তার থেকেই অগ্নি বায়ু প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ হিসাবে এক একটি ভগবানের সৃষ্টি হয়।

এই ভাবে গবেষণা এবং অনুসন্ধানের সুরু হয়। এই গবেষণা শুধু মূল সত্য উদঘাটনের জন্য বা শুধু জ্ঞান পিপাসার জন্য আরম্ভ হয়নি—মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই প্রধানত ইহার সুরু। এবং এই প্রয়োজন পদার্থিক পরিবেশের মধ্যেই নিহিত।

অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতেও ইহার গবেষনা সম্ভব। জীবতত্ত্বের ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা আমরা জীবের সৃষ্টির গোড়ার কথা জানতে পারি। বিভিন্ন জীবের মধ্যে পার্থক্য মোটামুটি দুই রকম: দৈহিক আকৃতির পরিবর্ত্তন এবং ব্যবহারের মধ্যে পরিবর্ত্তন। কি ভাবে আকৃতি পরিবর্ত্তন হচ্ছে এবং সেই পরিবর্ত্তন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উপর কি ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে? জীবনের প্রথম সঙ্কেত পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সহিত সংঘাত। জড়বস্তুর সংগে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত প্রতিঘাত হয় না, একমাত্র জীবজগতেই তা' হয়। তাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত ঘাত প্রতিঘাতই জীবনের প্রথম নমুনা।

মানুষ জীবেরই প্রগতির বিকাশ এবং এই নূতন জীব নূতন ভাবে পরিবেশের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই নূতন ভাব বুদ্ধি-জাত। অনুন্নত জীবের মধ্যেও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বুদ্ধি বা মনই সবথেকে প্রধান। মানুষের বেলায় এই ঘাত-প্রতিঘাত যান্ত্রিক ভাবে ঘটে না ; মূলত যান্ত্রিক হলেও, জানবার ইচ্ছা থেকেই সৃষ্টি। জানবার প্রাথমিক প্রচেষ্টাই বিজ্ঞানের সুরু। বিজ্ঞান কথাটার মানেই হলো—জানবার ইচ্ছা বা জ্ঞান। পদার্থিক ঘটনাবলীর কারণ জানবার ঔৎসুক্যই বিজ্ঞানের প্রেরণা, এই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা ক্রমশ অপ্রাকৃতিকতায় এসে পৌঁছায়। অন্য কোনরকম প্রাকৃতিক, বৈজ্ঞানিক, সোজা কারণ না পেয়ে, আদিম মানুষকে পদার্থিক ঘটনার অলৌকিক ঐশ্বরিক কারণই নির্দ্দেশ করতে হয়। এইসব অনুমানও বৈজ্ঞানিক গবেষণার অবিচ্ছিন্ন অংশ। অনুমান ছাড়া কোন গবেষণার সুরু হয় না। ক্রমশ অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে হয় অনুমানটি ভুল প্রমাণিত হয়ে তাহার প্রকৃত কারণ পাওয়া যায়, আর না হয় অনুমানটির স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক কারণ ও যুক্তি পাওয়া যায়। যতদিন যান্ত্রিক বিজ্ঞান এবং মানুষের বুদ্ধি অনুন্নত অবস্থায় থাকে, ততদিন অলৌকিক এবং অপ্রাকৃতিক অনুমান অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এগুলিকে অনুমান অপেক্ষা বেশী কিছু বলা যায় না।

পদার্থিক ঘটনার আনুমানিক অলৌকিক কারণ নির্ধারণ করার আদিম মানুষের এই প্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্যের

পরিচয়। ইহার ভিত্তি হলো এই যে, প্রতেক ঘটনারই কোন না কোন কারণ আছে, শূন্য থেকে কিছুই ঘটতে পারে না।

মানুষের সমস্ত অস্তিত্বই তার পারিপার্শ্বিক পদার্থিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। মানুষ ক্রমশ অনুভব করে যে, ইহাদের উপর অধিকার এবং প্রভাব বিস্তারই মানুষের জীবনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপায়। কিন্তু অধিকারের জন্য ক্ষমতা চাই এবং ক্ষমতা নির্ভর করে জ্ঞানের উপর। যেমন ধরা যেতে পারে বৃষ্টি। বৃষ্টি জমির উর্ব্বরতা আনে এবং তবেই মানুষ তার খাদ্য শস্য জন্মায়। এই জন্য সময়মত বৃষ্টির প্রয়োজন, এবং বৃষ্টি না হলে শস্য শুকিয়ে যায়। মানুষ যদি জানতে পারে যে, কি জন্য বৃষ্টি হয় এবং কোন সময়ে হয়, তাহলে ঠিক সেই সময় সে তার জমি চাষ করতে পারে এবং তাহলে তার শস্য শুকিয়ে যাবার আর ভয় থাকে না এবং তাহলে আর সে বৃষ্টির অনুগত হয়ে, অসহায় হয়ে পড়বে না। কি জন্য বৃষ্টি হয় তা' যদি মানুষ জানে তাহলে কখন বৃষ্টি হবে তাও সে জানতে পারবে। এই-রকম অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধেও একথা খাটে।

বিবর্ত্তনের প্রথম যুগে, মানুষের জ্ঞান ছিল সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ। তখন প্রাকৃতিক ঘটনার কোন রকম পার্থিব কারণ নিদ্ধারণ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু দেখা গেল, প্রত্যেক বৎসরই একই সময়ে বৃষ্টী পড়ে, নদী সব-সময়েই নীচের দিকে বয়ে যায়, ঠিক সময়ে রাত্রি আসে, প্রতিদিনই ঠিক সময়ে সূর্য্য ওঠে। মানুষ তার নিজের কার্য্যকলাপের মধ্যেও এক অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখতে

পায়। প্রতিদিন সকালে সে ওঠে, রাত্রে শুতে যায়, কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর তার ক্ষিদে পায়—কিন্তু এসব তাকে জীবতত্ত্বের বিজ্ঞান দিয়ে জানতে হয় না, সহজাত ইচ্ছার সাহায্যেই সে এসব জানতে পারে এবং সেই ইচ্ছার জন্যই সে এসব করে। এই ঘটনাবলীর পিছনেও এক ইচ্ছা-শক্তি আছে। পৃথিবীতে সমস্ত ঘটনাই নিয়মাধীন। মানুষ এই সব ঘটনার কর্ত্তা নয় এবং হতে পারে না। শক্তিশালী কেউ নিশ্চয়ই এর মূলে আছে, এই ভেবে আদিম মানুষ তার নিজের অনুপাতে ভগবানের সৃষ্টি করে। এইভাবে বৃষ্টির ভগবান, সূর্য্য দেবতা, বায়ু দেবতা ইত্যাদি এক একটি ভগবানের সৃষ্টি হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পদার্থিক ঘটনাবলীর কারন জানবার ইচ্ছা থেকেই অলৌকিকতা এবং ঈশ্বর-অনুমানের সৃষ্টি। ভাল ভাবে বেঁচে থাকবার ইচ্ছা থেকেই এই জানবার প্রচেষ্টার সুরু। সুতরাং দর্শন আমাদের জীবন যাত্রা এবং জীবনের সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন বা বিজ্ঞান থেকে একেবারে পৃথক কোন শাস্ত্র নয়। দর্শনও বিজ্ঞান এবং দর্শন কথাটার মানেই হলো জ্ঞানের ইচ্ছা। যাঁরা শিক্ষা করে পড়া শুনো করে পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ জানতে উৎসুক, এবং এই নিয়েই ব্যপৃত থাকেন তাঁদেরই প্রথম দার্শনিক আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁরাই বিজ্ঞানের স্রেষ্টা।

আমরা সংস্কৃত পাঁজিপুঁথি থেকে জানতে পারি যে, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য জড়জগত সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করা এবং

দর্শনের উদ্দেশ্য আত্ম বা আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান অর্জন করা। কিন্তু এইসব adhoc অনুমান নিস্প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানের অর্থ উচ্চতর জ্ঞান, অর্থাৎ ভুয়ো দার্শনিক বা কল্পনামূলক চিন্তাধারা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সত্য জ্ঞানই হলো বিজ্ঞান। অপর অর্থে বিজ্ঞান বলতে কোন বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান এবং তাই প্রচলিত অর্থে ইহা দার্শনিক জ্ঞান অপেক্ষা নিকৃষ্ট স্তরে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের প্রবর্ত্তক কনদ ও কপিল, তাঁদের দর্শন কল্পনার উপর ভিত্তি করেন নি, জড়জগতের বিশ্লেষনের উপর গড়ে তুলে-ছিলেন। জড় জগতকে বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভক্ত করে তাঁরা তাঁদের বিশ্লেষন সুরু করেন। জড় জগতের জ্ঞান থেকেই তাঁরা পার্থিব ঘটনার যতকিছু কারণের অনুসন্ধান করেন। এতে করে বিজ্ঞানকে তাঁরা দর্শনের উচ্চে স্থান দেন; এবং দর্শনকে তাঁরা বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে তোলেন।

দর্শন ও বিজ্ঞানের এই সম্বন্ধ পাশ্চাত্য ইতিহাসে আরও স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। গ্রীক দর্শনের স্রষ্টা থেলস (Thales) জড় জগতের কারণ অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, পদার্থিক ঘটনার কারণ পদার্থিকই হবে। তিনি জলকেই মূল বা আদি বস্তু হিসাবে ধরেন এবং তাঁর মতে সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিই জল থেকে। তাঁর সমসাময়িক হেরাক্লিটাস্ (Heraclitos) সব কিছুর আদি হিসাবে ধরেন অগ্নি। প্রাচীন ভারতের তত্ত্বজ্ঞানী দার্শনিকেরা এবং আদিম বৈজ্ঞানিকেরা সব কিছু পার্থিব ব্যাপারকে "পঞ্চভূতের" সৃষ্টি বলিয়া ধরেন।

পদার্থিক জগতের সম্বন্ধে তৎকালীন অনুসন্ধান ও গবেষণার লিপি হিসাবেই উপনিষদের বৈশিষ্ট্য। অনেকের মতে অগ্নিই হচ্ছে সব কিছুর মুল; অনেকের মতে জল, আবার অনেকে ব্যোম, অনেকে আকাশ ইত্যাদিকে মূল বলে ধরেন। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই সুরুতে পদার্থিক ব্যাপারের কারণ পদার্থিক বলেই কল্পনা করা হয়, এবং পদার্থিক ঘটনাবলীকে এক মৌল পদার্থিকতায় পরিনত করবার চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু জ্ঞান অর্জ্জন করার সম্ভাবনা নির্ভর করে তৎকালীন অর্জ্জিত জ্ঞানের উপর। সেই প্রাচীন কালে মানুষের জ্ঞান এত কম ছিল যে, সেই সব আদিম গবেষণার দ্বারা নূতন জ্ঞান অর্জ্জন করা কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু এই জ্ঞানার্জ্জনের ঔৎসুক্য মানুষের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাই শত বাধা সত্বেও, মানুষের গবেষণা ও অনুসন্ধান চলে আসে, অজানা রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করবার প্রচেষ্টা পুরোদমে চলে ইহাই মানুষের জীবন এবং জীব শক্তি। কোন না কোন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক কারণের প্রয়োজন যাতে করে মানুষ সব কিছু ব্যবস্থা করতে পারে ইহাই আনুমানিক তত্বাজ্ঞানজনিত দর্শনের গোড়ার কথা। গোড়াতে অনুমানের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। আদিম যুগে বহু ভগবানের কল্পনা করা হতো; পরে প্রশ্ন ওঠে এইসব দেবতা কে সৃষ্টি করে এবং তাই থেকে একেশ্বরের প্রচলন হয়। এই থেকে আরও অনেক বিতর্কের পর বহু ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। কেন ভগবান এই নির্দ্দিষ্ট ভাবে জগতকে পরিচালনা করেন ইত্যাদি

প্রশ্ন নিয়ে এক এক ধর্ম্ম বিজ্ঞানের (Theology) সৃষ্টি হয়। দেবতাকে যখন জড়জগতের স্রষ্টা হিসাবে কল্পনা করা হলো তখন মানুষের স্বাভাবিক যুক্তির বশেই সে দেবতার বিষয় জানতে উৎসুক। তাই থেকে ঈশ্বরবাদের (Theology) সৃষ্টি।

ক্রমশ ধর্ম্মাত্মক দর্শন বা ঐশ্বরিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি ও প্রচলন হয় এবং মানুষ আবার বৈজ্ঞানিক গবেষণা সুরু করে। এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ঔৎসুক্য থেকেই মানুষের সামাজিক বা অধ্যাত্মিক জীবনের সুরু। আদিম প্রচেষ্টায় মানুষ বাস্তবিক সংজ্ঞা দিয়ে পদার্থিক ঘটনাবলী সমর্থন না পেয়ে, অনুমানিক কারণের সৃষ্টি করে কিন্তু এই অনুমানও বৈজ্ঞানিক গবেষনা ও ঔৎসুক্যের পরিচায়ক। অভিজ্ঞতার সাহায্যে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। মানুষ যেমন করে আগুন জালতে শেখে, সেই ভাবে প্রত্যেক ঘটনাব কারণ এবং যে নিয়মের তারা অনুগত তা' জানতে পারে। এবং এই ক্রমোবদ্ধিত জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনাবলী পদার্থ-বিজ্ঞান দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারে। সে জানতে পারে কি জন্য বৃষ্টি হয়, বাতাস কেন বয় ইত্যাদি এবং এর ফলে ঐশ্বরিক কারণ দূরীভূত হয়।

আদিম কালে, অজ্ঞানতা মানুষকে পদার্থিক ঘটনার ঐশ্বরিক কারণ-অনুমান করতে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এক একটি ঘটনার এক একটি দেবতা তৈরী করতে বাধ্য করে। পরে,

জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, মানুষ সেই সব ঘটনা সহজ, সরল ভাবে, পদার্থিক নিয়মের সাহায্যে বাখ্যা করতেও সমর্থ হয় এবং তার আর ভগবান সৃষ্টি করবার প্রয়োজন হয় না। মানুষ নিজেই যেমন ভগবানের স্রষ্টা, মানুষ নিজেই তেমনি তার নিরর্থক অপ্রয়োজনীয় সৃষ্টিকে আবার ধ্বংসও করে ইহাই হলো বিজ্ঞানের সার কথা। আজ যা খুব স্পষ্ট এবং সত্য বলে মনে হচ্ছে, তা শুধু আজকের জন্যই। যদি কাল আমরা দেখতে পাই যে, তা সত্য নয়, তার চেয়ে অধিক জ্ঞান আমরা পাই, তাহলে সেই পুরাতন অনুমানকে অগ্রাহ্য করে, নূতন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার ইহাই বিজ্ঞানের সার তথ্য। এক সময়ে নিউটনের কথাই ছিল বিজ্ঞানের শেষ কথা।

বৈজ্ঞানিকদের কাছে তিনি দেব-স্বরূপ ছিলেন। আজ তিনি সেকেলে, অনর্থক হয়ে পড়েছেন। শুধু ইহাই নয়, বিজ্ঞানের বহু প্রাচীন নিয়ম কানুন, যুক্তি-তর্কই আজ নিরর্থক। জ্ঞানের কোন সীমা নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, জ্ঞান কখনও সেকেলে, বা অকেজো হয়ে পড়ে না। পুরাতন জ্ঞানের ভিত্তিতেই নূতন জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর দেহের ব্যবহারিক এবং উপযুক্ত গঠনের মধ্যেই ইহা সুরু হয় এবং সেই থেকে জ্ঞান বাড়তেই থাকে। দর্শন এবং বিজ্ঞান—এ দুয়েরই এই প্রণালীর সহিত সংশ্লিষ্ট! জ্ঞানার্জ্জনের আধার হলো বিজ্ঞান, এবং নূতন জ্ঞানার্জ্জনের জন্য অর্জ্জিত জ্ঞানকে নিয়মাবদ্ধ, শৃঙ্খলাবদ্ধ করার কাজ হলো দর্শনের

পার্থিব জীবন থেকে পৃথকভাবে জ্ঞান অর্জ্জন করা সম্ভব নয়। সমস্ত জ্ঞানই মানুষের জীবনের এক বিশেষ অংশ। দৈহিক প্রক্রিয়াই হলো জ্ঞানের আধার এবং দৈহিক প্রক্রিয়া যান্ত্রিক ঘাত-প্রতিঘাতের উপরই নির্ভর করে। জ্ঞানার্জ্জনের মধ্যে অলৌকিক, অপ্রাকৃতিক ব্যাপার কিছুই নাই। মস্তিস্ক দেহের একটি যন্ত্র বিশেষ, আর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিও পদার্থক। ইহার মধ্যে অপ্রাকৃতিক কিছুই নাই, যেমন আয়নায় নিজের চেহারা দেখা।

প্রকৃত জ্ঞানই হলো বিজ্ঞান। যদি জ্ঞান এবং বিজ্ঞানকে পৃথক পৃথক ভাবে দেখতে হয়, জ্ঞানকে মানসিক বোধ বা বোধ-শক্তি হিসাবে ধরা যেতে পারে। বোধ-শক্তি জ্ঞানের চেয়ে বড় কখনই নয়। জ্ঞান অর্জ্জন করা শিক্ষাসাপেক্ষ এবং তা বোধশক্তি অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের। বোধশক্তি তো আদিম জীবের মধ্যেও আছে কিন্তু জ্ঞানার্জ্জনের, সমস্ত ব্যাপারের তথ্য জানার ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে। নিম্নতর জীবেদের মধ্যে বোধশক্তি ও বুদ্ধি বহুস্তরে বিভক্ত। এবং জ্ঞান-এই বোধশক্তি ও বুদ্ধির উচ্চতর, প্রকৃষ্টতর রূপ : বোধ-শক্তির ব্যাপক রূপ। বোধশক্তি জীবের এবং জৈবিক অস্তিত্বের বিশেষ অঙ্গ। সুতরাং জ্ঞান যদি শুধুমাত্র বোধশক্তি হয়, তাহলে বিজ্ঞানকে আরও উঁচুতে স্থান দিতে হয়।

এইদিক দিয়ে বিচার করলে দর্শনের চেয়ে বিজ্ঞান বড়। কিন্তু দর্শনকে যদি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমষ্টি হিসাবে ধরা হয়,

তাহলে দর্শনকে আরও উঁচুতে স্থান দেওয়া যায়। প্রাচীন বলেই বিজ্ঞানের চেয়ে জ্ঞান বড় নয়; জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের গবেষনা ও অনুসন্ধানের ফলে যে জ্ঞানের সৃষ্টি হয়, তার সমষ্টিগত প্রকাশ হিসাবে জ্ঞান বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেয়।

রাজনীতির সঙ্গে এই আলোচনার সম্বন্ধ এই যে, রাজনীতি বা বিপ্লব বলতে সাধারণ লোকে বোঝে মারামারি, কাটাকাটি, অত্যাচার, পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়া। এই সব ভ্রান্ত এবং বীভৎস ধারণা থেকে রাজনীতিকে মুক্ত করতে হবে। তবে রাজনীতি কাজে আসবে।

বিপ্লব বা বিপ্লবী বলতে কি বুঝায়? পৃথিবী যে কোন অলৌকিক শক্তিদ্বারা পরিচালিত নয় এবং আজ যে অবস্থায় পৃথিবী আছে মানুষ নিজের শক্তিতে তাকে উন্নত এবং নূতন করে গড়ে তুলতে পারে—এই ধারণা যার আছে সেই বিপ্লবী। বিপ্লবী আরও বলে যে, পৃথিবীকে বহুবার নূতন করে গড়া হয়েছে এবং প্রয়োজনের তাগিদেই তা' করা হয়। ভারতবর্ষের যে সব লোক আমাদের দেশকে নূতন করে গড়ে তোলবার প্রয়োজন অনুভব করেছে এবং বিশ্বাস করে যে, ভারতের জনসাধারণের সেই শক্তি আছে, তারাই হলো বিপ্লবী। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যতিরেকে কেউই বিপ্লবী হতে পারে না, প্রকৃত বিপ্লবী হতে হলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। বিপ্লবী হতে হলে এই দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন যে মানুষ শুধু জগতকেই নোতুন করে গড়তে পারে তাই নয়, মানুষ ভগবানকেও তৈরী করতে পারে,

ধ্বংসও করতে পারে এবং সৃষ্টির সুরু থেকেই তা' করে আসছে। মানুষের প্রকৃতিই হচ্ছে ভগবান প্রতিষ্ঠা করা, তাকে পুনশ্চ ধ্বংস করা এবং নূতন দেবতার সৃষ্টি করা।

সমাজের বিবর্ত্তনের সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় গঠনে কতকগুলি মূল সিদ্ধান্ত রচনা করা হয়। যদি সেই সিদ্ধান্তগুলিকেই আমরা চিরন্তন, অপরিবর্ত্তনীয় বলে মনে করি তাহলে জগতকে নূতন করে গড়ে তোলবার প্রশ্ন ওঠেনা। বিবর্তন-ভীরু লোকেরা বিপ্লবীদের হয় পাগল না হয় কল্পনাবিলাসী মনে করেন। কিন্তু রাজনৈতিক সূত্রগুলি শুধুই কল্পনা-মূলক নয়, মানুষের দৈনন্দিন সামাজিক জীবনের অবস্থার উপরই তার ভিত্তি এবং সেই সামাজিক অবস্থার প্রতীক হলো প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। সুতরাং রাষ্ট্রীয় রীতিনীতির মূলগত ব্যবহারিক সংজ্ঞা আছে। সামাজিক অবস্থার মত রাষ্ট্রীয় রীতিনীতিও মানুষের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট; তাই যখনই প্রচলিত সমাজব্যবস্থা অসহ্য হয়ে ওঠে তখনই আমরা তাদের পরিবর্ত্তন করতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু আমাদের যদি এই দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে যে, আমরা তাদের পরিবর্ত্তন করতে পারি—তাহলে আমরা এর প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করতে পারিনা। আমরা যদি গোড়াতেই ধরে নিই যে, সমস্ত কিছুই পূর্ব্বকল্পিতভাবে এবং ঐশ্বরিক ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটে তাহলে আমরা সেই সামাজিক ব্যবস্থা বা প্রচলিত রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তগুলি পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়াস পাই না। ভগবদ্ ভয়ে ভীত লোক কখনও ভগবানের সৃষ্টিকে

পরিবর্ত্তন করার উৎসাহী হতে পারে না। পরিবর্ত্তন করার ইচ্ছা আমাদের তখনই আসতে পারে যখন আমরা জানতে পারি যে, ভগবান আমাদেরই সৃষ্টি এবং আমরা ইচ্ছানুযায়ী যে কোন দেবতাকেই তার উচ্চাসন থেকে নামাতে পারি। যখনই আমরা উপলব্ধি করি যে, আজকের জগত যা হওয়া উচিত তা নয়, এর আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, তখনই, আমরা তার স্রষ্টা ঈশ্বরকেও অকর্ম্মণ্য, অনুপযুক্ত বলে সরিয়ে দিতে পারি। যখনই আমরা জানতে পারবো যে, ভগবান আমাদেরই সৃষ্টি, তখনই আর আমাদের সেই কালাপাহাড়ী (iconoclastic) শক্তির প্রতি কোন ভীতি থাকবে না। এবং এই মানসিক শক্তি আমরা জ্ঞান থেকে লাভ করি, যার দ্বারা আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, দর্শন বিজ্ঞান থেকে পৃথক, উচ্চতর কোন শাস্ত্র নয়।

অনেকের ধারনা বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষনার দার্শনিক ফলাফলকে বিচার করলেই দেখা যাবে যে, দর্শন ও বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিনষ্ট হয়ে গেছে। এতক্ষন পর্যন্ত আমরা শুধু উনবিংশ শতাব্দী এবং তার পূর্ব্বেকার বিজ্ঞান নিয়েই আলোচনা করেছি, কারন আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিকভাব পর্যালোচনা এবং উপলব্ধি করতে হলে—এই আলোচনার প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানই আধুনিক বিজ্ঞানের বনেদ।

সাধারণত, বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা ধারনা আছে যে, ইহা মনেরই কল্পনা; বিজ্ঞান আমাদের বাস্তব জীবনের প্রকৃত জ্ঞান অর্জ্জনে কোন সাহায্য করে না। তাই ধরে নেওয়া হয়

যে, আধুনিক বিজ্ঞানও 'আমাদের সেই প্রাচীন দর্শনের জায়গায় এনেছে—যে দর্শনে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য এই জগতের মিথ্যা প্রবঞ্চনা থেকে উদ্ধার করে একমাত্র সত্য—ঈশ্বরে জীবনকে বিলীন করা।

আদিম মানুষের বাস্তব জগত সম্বন্ধে অনিসন্ধিৎসার শেষ পর্যায় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত পরমানুর কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত—অর্থাৎ সমস্ত পদার্থিক ব্যাপারের মূলই হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর কনা—পরমানু। এই পরমানু সিদ্ধান্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক গবেষনার ফল নয়, ইহা বিজ্ঞানের প্রথম যুগ থেকেই বিদ্যমান। গ্রীসে ডেমোক্রাইটস্ (Democritas) এবং ভারতবর্ষে কনদ প্রায় একই সময়ে এই সিদ্ধান্ত গঠন করেন। পরবর্ত্তী অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগন এই মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন; অবশেষে নিউটন এবং ড্যালটন আধুনিক বিজ্ঞানের রূপে এই সিদ্ধান্তকে প্রকাশ করেন। এর ফলে পদার্থ বিজ্ঞান দ্রুত উন্নত হতে থাকে এবং একে একে প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ নির্ধারন করতে সক্ষম হয়। প্রকৃতির বহু রহস্যই এতে করে উদ্‌ঘাটিত হয়, এবং গত দুশো বৎসরের উন্নতি ও প্রগতি বোধহয় তার পুর্ব্বেকার যুগ যুগান্তরের ইতিহাস অপেক্ষা বেশী।

সাম্প্রতিক আরও গবেষনার ফলে জানা গেছে যে, পরমানু অচ্ছেদ্য নয়। আরও ক্ষুদ্রতর বস্তুর সমন্বয়েই পরমানুর সৃষ্টি। যে ক্ষুদ্র বস্তুর সমন্বয়ে পরমানুর সৃষ্টি তার নাম' ইলেকট্রন

এবং ইলেকট্রন হচ্ছে এক প্রকার বৈদ্যুতিক ঢেউ। এই ঢেউ নিয়ে এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়, কারণ এর গতি ও আকৃতি আবার একই সময়ে সঠিক নির্ধারিণ করা যায় না। এবং এই রহস্যময় গবেষণাই প্রাকৃতিক কারণ নির্ধারণের মূল। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও অনেক বড় বড় লোকের মনে এই থেকে প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক বাখ্যায় অশ্রদ্ধা জন্মায় এবং তাঁরাই এক নূতন মতের প্রবর্ত্তক হন। তাঁদের মতে আমাদের জ্ঞানের বেশীর ভাগই আমাদের মনের সৃষ্টি এবং তার সঙ্গে বাইরের বাস্তবের কোন সম্বন্ধ নেই; সুতরাং বিজ্ঞান যে বহির্জগতের বাস্তবতা প্রমান করেছে ইহা ভ্রান্ত। তাঁরা বলেন: 'এই যে গাছ, এ লোকের মনের ধারনা, সত্য সত্যই গাছটা আছে কিনা কেউ বলতে পারে না। কারন গাছ সম্বন্ধে যে ধারনা তা আমাদের মস্তিস্কে গাছের যে ছবি চোখের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয় তার উপর, কিন্তু এই যে ছবি মস্তিস্কে প্রতিফলিত হয় তার সঙ্গে দূরে যে গাছটা আছে তার সঙ্গে প্রকৃত কি সম্বন্ধ তা নির্ধারন করবার কোন উপায় নেই। তাই এটা যে শুধু মানসিক ধারনার প্রতিচ্ছবি নয় তাত ঠিক করে বলা যায় না। গাছটাই মূল না তার মানসিক ধারনাটা মূল তা কি করে জানা যাবে।' বস্তুত ইহাই জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল সমস্যা। গোড়া থেকেই কি করে জ্ঞান অর্জ্জন হয় এই সমস্যাতেই দর্শন ব্যাপৃত ছিল। প্রথমত, জ্ঞান বিজ্ঞানই দর্শন নয় এবং এইটেই না বুঝতে পারাতে দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ নিয়ে যত

সমস্যার সৃষ্টি। দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক দর্শনে ব্যক্তিগত ভাব ও মনের গুরুত্ব কম নয় এবং ইহা মনকে অস্বীকারও করেনা। বাস্তব ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে কোন কিছু নেই। জ্ঞানার্জ্জনের তিনটি উপাদান ; বহির্বস্তু, ব্যক্তি এবং মন অর্থাৎ জানবার যন্ত্র। মনের সাহায্য ব্যাতিরেকে জ্ঞান সম্ভব নয় ইহার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। আধুনিক রহস্যবাদী বৈজ্ঞানিকেরাও তাই বলেন যদিও, ইহা সকলেই জানে এবং ইহাকেই তাঁরা আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিক উপাসংহার বলে ব্যক্ত করেন এবং ধরে নেন যে, দর্শন বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেয়। এই সব যুক্তি দেখিয়ে বলা হয় যে আধুনিক বিজ্ঞান বস্তুবাদের বনেদ ভেঙে দিয়েছে। এই মতের শেষ কথা হলো এই যে, পৃথিবী বাস্তব নয় এবং প্রকৃতিক ও পদার্থিক নিয়মাদির দ্বারাও পরিচালিত নয় কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিকই এতটা স্বীকার করবেনা যদিও ইহাই হলো পূর্ব্বোক্ত মতের যৌক্তিক পরিনাম। তাছাড়া যদি এই পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য উদঘাটনের এবং পদার্থিক নিয়মাদি ও প্রগতির কারন জানবার ক্ষমতা মানুষের না থাকে, বা যদি এরকম কোন নিয়মই না থাকে, তাহলে মানুষ যে জগতকে এবং সমাজ ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে পারে—এই বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিতে হয়।

জগত চিরপরিবর্ত্তনশীল এবং মানুষই সেই পরিবর্ত্তনে সর্ব্ব প্রধান অংশ গ্রহন করে এই দৃঢ় ধারনাই একমাত্র ঐ সব ভ্রান্ত অবাস্তব ধারনা দূর করতে পারে। কারণ ঐ ধারনা অনুযায়ী

রাজনীতির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকেনা—সমাজ-বিজ্ঞানের অস্তিত্ব লোপ পায় এবং বিপ্লব বলে কোন কিছু থাকে না। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিক মতানুযায়ী সমাজ-বিজ্ঞান অসম্ভব হয়ে ওঠে কিনা এবং রাজনীতি একমাত্র বদমায়েসি ও পাগলের উপজীবিকা হয়ে দাঁড়ায় কি না। কিন্তু ইহার স্পষ্ট উত্তর 'না'। কারণ, আধুনিক বিজ্ঞান মাত্র ইহাই বলে যে, জানবার জন্য মনের প্রয়োজন। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে সাধারনত, লোকের মনে কতকগুলি ধারনা জন্মে যায় যে, মন বস্তুর থেকে পৃথক, মন ছাড়া জ্ঞান অর্জ্জনের কোন উপায় নেই, সুতরাং জ্ঞান মনেরই সৃষ্টি এবং বাস্তব জগত আমাদের মনের কাল্পনিক প্রতিরূপ, মনের বাহিরে কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সুতরাং যায় অস্তিত্ব নেই সে সম্বন্ধে চিন্তা করবার প্রযোজন নেই, এবং করবারও কিছু নেই, সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। কিন্তু এই সরল আদর্শবাদের মধ্যে কতকগুলি প্রশ্ন রয়ে গেছে। যদি কিছুরই অস্তিত্ব না থাকে এবং সবই মনের কল্পনা হয়, তাহলে আর সকলের মনও আমার মনেরই কল্পনা হয়ে দাঁড়ায়, সুতরাং আমার মন ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই—কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই—এবং জগতের কল্পনা করবারও কেউ নেই—কিন্তু আধুনিক আদর্শবাদী বা অধ্যাত্ম-বাদীরা এতদূর পর্যন্ত যেতে রাজী নন যদিও তাঁরা বিজ্ঞানকে অবাস্তব প্রমান করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু যদি তাঁরা এতদূর না গিয়ে এইটুকু বলতে চান যে শুধু মনেরই অস্তিত্ব আছে

এবং প্রত্যেকের মনেরই অস্তিত্ব আছে—তাতেও বিশেষ সুবিধা হবে না। সত্তার নিজস্ব কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না; আত্মানুভূতির মূলই হলো অপর কোন সত্তার অস্তিত্ব এবং এই অন্যের অস্তিত্বের উপরই আত্মসত্তা নির্ভর করে। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ রহস্যময় ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুভবের জন্যই বাস্তব জগতের সৃষ্টির ও অনুভবের বিশেষ প্রয়োজন। এবং যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব সত্য ও বাস্তব হয় তাহলে সৃষ্টি ও বাস্তবও প্রত্যক্ষ হবে। পৃথিবী যদি বৈজ্ঞানিকদের মানসিক কল্পনা হয় তাহলে বৈজ্ঞানিকদের মনের মতই পৃথিবীও বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ। ছায়া যদি সত্য হয় তবে তায় কায়াও সত্য।

ধরে নেওয়া হোল সমস্তই মনের সৃষ্টি, সংকীর্ণ-শক্তি বিজ্ঞান, মন কি, তা বলতে পারে না। কিন্তু মন যাই হোক, ইহা মস্তিকের (brain) সাহায্যেই কাজ করে এবং মস্তিস্ক যে বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ ইহা কেউই অস্বীকার করবে না। এখানে আবার সেই পুরানো সমস্যার সম্ভব হয়: কি ভাবে মস্তিক পরিচালিত হয়? চিরাচরিত দর্শন ইহার উত্তর দিতে অপারক। একমাত্র আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যেই আমরা ইহার উত্তর দিতে পারি; আধুনিক বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান দিয়েছে এবং হয়তো আরও অনেক কিছু অজানা আছে। কিন্তু যা কিছুই আমরা ঠিক জানি না, তাই যে রহস্য-পূর্ণ ইহা অত্যন্ত ভূল ধারনা। পূর্ব্বে এক সময় আমরা বিদ্যুত

কি তাও জানতাম না। তখন ইহা অত্যন্ত রহস্যময় ঘটনা ছিল এবং হিন্দুরা বিদ্যুৎকে ইন্দ্রদেবের বজ্রের ঝলকানো আলো বলে অভিহিত করত। কিন্তু আজ আমরা জানি যে, ইহা সত্য নয়। আমাদের জ্ঞান এখনও সীমাবদ্ধ এবং বহু জিনিষ আছে যে সম্বন্ধে আমাদের এখনও কোন জ্ঞান নেই, কিন্তু সে জন্য ইহা বলা অত্যন্ত ভুল এবং অনুচিত হবে যে, আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানও ভ্রান্তি পূর্ণ। এই যে নব-রহস্যবাদ, অজ্ঞানতাকে এই যে দুর্ব্বলের পূজাকরা, মানুষের জানবার ক্ষমতাকে অস্বীকার করা আর তথাকথিত গণিতিকদের এই যে গণিতবিদ ঈশ্বর কল্পনা এই সবের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে এসেছে।

হয়তো এখনও আমাদের জ্ঞান খুবই কম—হয়তো পদার্থ জগত সম্বন্ধে আমরা এখনও সবিশেষ জানি না, কিন্তু তাতে করে আমাদের জানবার উৎসাহ ও প্রচেষ্টা আরো বাড়া উচিত এবং এই প্রচেষ্টাই হলো জীব-শক্তি—জীবনের সার। যে দিন থেকে মস্তিকের সৃষ্টি হয়েছে সেই দিন থেকেই জানবার প্রচেষ্টাও সুরু হয়েছে। এর কোন শেষ নাই, জ্ঞান ক্রমাগতই বাড়তে থাকবে, হয়তো জ্ঞানের গণ্ডী এখনও খুবই সীমাবদ্ধ—কিন্তু অজানাকে জানবার যে বিস্তৃত ভূমি পড়ে আছে—তাই হলো প্রকৃত অসীমের পরিপ্রেক্ষিত—এই অসীম হলো মানবের প্রকৃত অধ্যাত্ম। যেহেতু জানবার প্রক্রিয়া বাস্তব মস্তিস্কের সহিত সংশ্লিষ্ট, সুতরাং মন অজানা অবাস্তব, রহস্যময় কিছু হতে পারে না এবং অবাস্তব জগতের কল্পনাতে প্রতিষ্ঠিতও হতে পারে না।

যদি আধুনিক বিজ্ঞান ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের সবজান্তা মনোভাবকে বিনষ্ট করে থাকে তো ভালই করেছে। আর জানবার নেই, সব জানা হয়ে গেছে—এই মনোভাবই মানুষের জীব-শক্তিকে ধ্বংস করে—কারণ, এই মনোভাব থেকে মানুষের কাজ করবার ইচ্ছা নষ্ট হয় এবং কর্ম্মক্ষমতাই হলো জীবনের অভিব্যক্তি। আধুনিক বিজ্ঞান মানব-সমাজের আত্মহত্যার আধার নয়, ইহা মানুষকে নিঃশেষ করতে চায় না।

পরমানুই ক্ষুদ্রতম বস্তুকনা নয় ইহা সত্য। পরমানু ইলেকট্রন নিয়েই গঠিত এবং ইলেকট্রনও স্থায়ী নয় কিন্তু সাধারণ বস্তু সম্বন্ধে যে ধারনা প্রচলিত আছে সে হিসাবে না হলেও ইলেকট্রনও বস্তু; এবং তা না হলে ইহাকে পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা বস্তু করা যেত না। পদার্থ বিজ্ঞানের কাজই হলো রূপ নিরুপন করা এবং এর মাপকঠি সবক্ষেত্রেই বাস্তব এবং পদার্থিক সংজ্ঞা বিশিষ্ট। গনিতশাস্ত্রের অজানা অঙ্ক যখন কিছুকে ব্যক্ত করে তখনও তাহাদ্বারা বাস্তব সংজ্ঞাই বোঝায়—পদার্থ বিজ্ঞান যা কিছু নিরূপন করে বা অঙ্কের দ্বারা ব্যক্ত করে সবই বাস্তব এবং পদার্থিক সংজ্ঞা এবং ইলেকট্রনও সেই রকম একটি বাস্তব সংজ্ঞা।

পার্থিব জগতের বনেদের গঠন সম্বন্ধে আমাদের ধারনার পরিবর্ত্তন হয়েছে; কিন্তু তাতে করে তার বাস্তবতা লোপ পায় নি। এই নূতন বনেদকেও আমরা আমাদের পদার্থিক মাপকাঠি দিয়ে নিরূপন করতে পারি, এই নূতন সংজ্ঞা অসম্ভব। নয় এইটেই সব থেকে দরকারী কথা।

তাছাড়া কোন বৈজ্ঞানিকই একথা বলবে না যে, এই জগতের ঘটনাবলী কোন নিয়মকানুনের বশীভূত নয়। আগে কয়েকটি নিয়ম বা সিদ্ধান্তকে আমরা চূড়ান্ত বলে ধরে নিতাম এখন দেখা যাচ্ছে যে, এই সব নিয়ম বা সিদ্ধান্তও অন্য নিয়মদ্বারা চালিত। বিজ্ঞান জগতকে নিয়মানুবর্ত্তী (নিয়ম-তান্ত্রিক) হিসাবেই গন্য করে, শূন্য থেকে ইহার উদ্ভব ইহা বিজ্ঞান মানে না। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষনা করে এই জানতে পেরেছে যে, ইহা জড় বস্তুর দ্বারা গঠিত নয়, ক্রিয়াশীল, পরিবর্ত্তনীয় ঘটনা নিয়েই এই জগত সংগঠিত। জগত স্থির নয়, ইহা পরিবর্ত্তনের প্রতীক ।

মানুষের জ্ঞান ক্রমবর্দ্ধমান। এই ক্রম বর্দ্ধমান জ্ঞান, সময়ের সাথে সাথে এবং প্রয়োজনের তাগিদে অনেক নিয়ম, সিদ্ধান্ত যা ভ্রান্ত প্রমাণ হয়েছে তাকে বাতিল করে । এই ভাবে যেমন এক একটি সিদ্ধান্ত বাতিল হয়েছে, তেমনি নূতন নূতন যুক্তিযুক্ত নিয়ম ও সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইহাই হলো বস্তুবাদের ভিত্তি। সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনারই বাস্তব ভিত্তি আছে এবং তা' যে নিরূপনযোগ্য এই স্বীকৃতিই হলো বিজ্ঞানের ভিত্তি ও গোড়ার কথা; ইহা ব্যতিরেকে কোন বিজ্ঞান হতে পারে না এবং জ্ঞানার্জ্জনের উপায়ও অসম্ভব হয়ে যায়। আধুনিক বিজ্ঞান বিজ্ঞানের এই বনেদ ভেঙ্গে দেয়নি; আধুনিক বিজ্ঞান শুধু বিজ্ঞান ও দর্শনের পার্থক্য লোপ করে দিয়েছে। একমাত্র দর্শনের যে সব চিরাচরিত সমস্যা—কাল,

স্থান, বস্তু এবং কারনকার্য্য এসবই এখন বৈজ্ঞানিক গবেষনার অন্তর্ভূক্ত এবং বিজ্ঞান এই সব সমস্যার সমাধানও করেছে এখন আর এ সব সমস্যা নিয়ে কোন কল্পনার প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞান এই অবস্থায় উন্নীত হলে' পর, হয়ে দাঁড়ায় সর্ব্ববিধ জ্ঞানের সমন্বয় এবং মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দর্শন নিজেকেও পরিবর্ত্তিত করতে থাকে। আমাদের দেশে যা দর্শন বলে চির-প্রচলিত তার সঙ্গে অবশ্য এই বৈজ্ঞানিক দর্শনের অনেক পার্থক্য। জগতের রহস্যময় অলৌকিক ধারনাকে এখন আর দর্শন বলে অভিহিত করা যায় না।

যা আমরা জানিনা তারই একটা রহস্যময় অলৌকিক কারণ অনুমান করা অজ্ঞানতারই লক্ষন। উনবিংশ শতাব্দীর একজন বৈজ্ঞানিক রেমণ্ড বো (Raymond Du Bois) এই নব অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে বলেন যে, আমরা কিছুই জানিনা এবং জানতে সক্ষম নই—এই হলো দর্শনের সার কথা। এবং যে সব আধুনিক বিজ্ঞানিকেরা বলেন যে, বিজ্ঞান আমাদের এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে, তাঁরা তাঁদের দুর্ব্বলতাকেই সমর্থন করেন এবং তাতেই আনন্দ পান। কিন্তু, বিজ্ঞান ইহা সমর্থন করেনা এবং যাঁরা জ্ঞানকেই একমাত্র শক্তি বলে কল্পনা করেন এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে জগতকে নূতন করে গড়ে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তারা একথা মানতে রাজী নন। বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মীদের দর্শন রহস্যবাদ নয়; বৈপ্লবিক রাজনীতির দর্শন হলো বৈজ্ঞানিক দর্শন। একমাত্র এই বৈজ্ঞানিক দর্শনে অনুপ্রেরিত হলে,

তবেই রজনীতি ক্ষমতা লোভী, শঠ, প্রবঞ্চকদের হাত থেকে উদ্ধার পাবে। রাজনীতির সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের অনেক পার্থক্য।

আধুনিক রহস্যবাদী এবং তাদের ছাত্রদের রাজনীতিকে এই ভুয়ো দার্শনিক ভাবে ব্যক্ত করার মধ্যে একটি গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। উদেশ্য হলো এই প্রমান করা যে, সামাজিক ব্যবহার কোন নিয়মাবর্ত্তী নয়, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গুলিকে মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন নেই এবং সর্ব্বোপরি, মধ্যে মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থায় বিপ্লবের কোন প্রয়োজন নেই। এই সবেরই মূল হলো এই যে, বিজ্ঞানের আর প্রয়োজন নেই; পদার্থ-জগত কোন নিয়মের বশীভুত নয় এবং অসংখ্য অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটেছে যার কারন বিজ্ঞান কখনও অনুমান করতে পারেনি বা পারবেনা। এই বিরাট বিশ্ব-জগতের মধ্যে সমাজেও ঠিক এই রকম ঘটনা ঘটছে যা নিয়মের বাইরে এবং যার মধ্যে কোনকারন পাওয়া যায়না এবং এখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। এই যে দার্শনিক মত—ইহাই হলো ফ্যাসিবাদের ভিত্তি।

অর্থাৎ যাঁরা বিজ্ঞানের ডিগবাজী এবং সঙ্গে সঙ্গে রহস্যময় অধ্যাত্মবাদী দর্শনের উত্থান নিয়ে মাতামাতি করছেন—তাঁরা শুধু বিপ্লবের জাগৃতি শক্তির বিরুদ্ধে এক বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করছেন। পৃথিবীতে একটা বিরাট পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়েছে। বিজ্ঞান আজ বহু লোককে এই জ্ঞান ও এই অনুপ্রেরনা দিয়েছে যে মানুষের জগতকে পরিবর্ত্তন করবার ক্ষমতা

আছে। সেই অনুপ্রেরনা ও উৎসাহ পেয়ে, আজ জনসাধারণ, জগতকে নূতন করে গড়ে তোলবার জন্য, মানুষকে ও সমাজকে সুখী ও উন্নত করবার জন্য পৃথিবীতে এক বিরাট দল সৃষ্টি করছে। এই বিপ্লবকে রোধ করবার জন্যে, প্রতিষ্ঠিত মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে, মানুষের বিশ্বাসকে বিনষ্ট করতে, আজকের ভুয়ো দর্শন এই প্রচার করছে যে, মানুষ যন্ত্রবিশেষ, ভাগ্যের দাস, যে অলৌকিক অপ্রাকৃতিক শক্তি মানুষকে ও জগতকে পরিচালিত করছে, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মানুষকে চলতেই হবে। বিজ্ঞান আজ দর্শনকে এই মিথ্যা—প্রবঞ্চনা থেকে উদ্ধার করেছে। বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে দর্শন বহুদিন শাষক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে এসেছে, তার উদ্দেশ্য নষ্ট করে এসেছে; আজ আবার দর্শন তার প্রকৃত স্থান ফিরে পেয়েছে।

আজ বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সমস্ত পার্থক্য লোপ পেয়েছে। এখন দার্শনিকদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সন্নিবদ্ধ করে, মানব-সমাজকে সেই জ্ঞানের সাহায্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই দর্শনের কাজ। রাজনীতি হলো দৈনন্দিন জীবনের, মানুষের আচার ব্যবহারের বিজ্ঞান, এবং সেই জন্যে রাজনীতির সঙ্গে বিজ্ঞান ও দর্শনের নিগূঢ় সংযোগের প্রয়োজন। কিন্তু রাজনীতির এই দিকটাই এখনও লোকে উপলব্ধি করেনি; তাই আজও রাজনীতি পাগল, বদমায়েস বা ভাগ্যান্বেষী লোকদের একচেটিয়া।

অধুনা একদল রাজনীতিজ্ঞের উদ্ভব হচ্ছে যাঁরা রাজনীতিকে দর্শন হিসাবে নিয়েছেন এবং যাঁদের প্লেটোর ভাষায় দার্শনিক সম্রাট বলা যেতে পারে; তবে আমাদের দার্শনিক সম্রাটের প্রয়োজন নেই, আমরা চাই দার্শনিক সামাজিক মানুষ। গণতান্ত্রিক সমাজ ও সামাজিক জীব গড়ে তুলতে হলে আমাদের বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকার প্রয়োজন এবং বিজ্ঞান, দর্শন ও রাজনীতির মধ্যে যে নিগূঢ় অবিছিন্ন সম্বন্ধ তাও অনুভব করা প্রয়োজন। সুতরাং রাজনৈতিক দর্শনের মূল সিদ্ধান্তগুলি ভুয়ো অবাস্তব হয়ে থাকলে চলবে না, মানুষের অভিজ্ঞতার উপরেই তাকে গড়ে তুলতে হবে। অর্জিত অভিজ্ঞতা যেমন সময়ের সাথে সাথে পরিবর্ত্তিত হতে থাকে, সেই রকম পুরাতন সিদ্ধান্তগুলিকেও বাতিল করে নূতন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দর্শন যেমন সর্ব্ববিধ বিজ্ঞানের জ্ঞানকে একত্রে সন্নিবদ্ধ করে, সেই রকম রাজনৈতিক দর্শনকে মানুষের সামাজিক জীবনের সমস্ত অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, পরিবর্ত্তিত করতে হবে। এই কারণেই মার্কস্‌ বলেছিলেন যে, রাজনীতির ভিত্তি সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থা। সমাজতন্ত্রবাদের ভীতি, সাম্রাজ্যবাদের বিভীষিকা বা মার্কসবাদের বীভৎসতা বলে যা প্রচলিত তা আর কিছুই নয়—সমাজসমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক উপায়। এইহলো মার্কসীয় দর্শন—বৈজ্ঞানিক দর্শন—মানুষের জ্ঞানের সমষ্ঠি—যাতে করে রাজনীতি হয়ে ওঠে উদ্দেশ্যময়, পূর্ণ এবং যা পরার্থপর মহৎ

নর-নারীকে রাজনীতিকে কর্ম্মজীব নর অঙ্গীভুত করে নিতে অনুপ্রেরীত করে। বিজ্ঞান সন্মত, জড় জগতের ন্যায় মনুষ্য-জীবনও নিয়মাবদ্ধ এবং সামজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ বাস্তবে পরিনত করতে হলে রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকেও বিজ্ঞানের সমস্যার মতই দেখতে হবে। যারা বিশ্বাস করে যে প্রয়োজন মত জগতকে পরিবর্ত্তন করার ও নূতন করে গড়ে তোলার ক্ষমতা মানুষের আছে—মার্কসবাদ তাদের রাজনীতি, এবং বৈপ্লাবিক আদর্শ ব্যাতিরেকে এই সব দার্শনীক রাজনীতিজ্ঞের রাজনীতির প্রতি কোন আকর্ষণ নেই।